প্রকাশক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ
৩/১ অক্রূর দত্ত লেন,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৫৭

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

কবিতা-সংগ্রহ

কুসুমের মাস

তুমি ফুল ভালোবাসো ? লাল ফুল ? চোখে যাহা লাগে ?
কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত ?
তুমি ভালোবাসো ফুল ? শেফালিকা সৌরভ-আনত ?
যে-ফুল ঝরিয়া পড়ে ক্ষীণাঙ্গুলে স্পর্শিবার আগে ?
আননে লেগেছে তব কেতকীর সৌরভ-দুকূল ?
হৃদয়ে কি বাজিয়াছে প্রগল্‌ভা হেনার উচ্চহাসি ?
তুমি ভালোবাসো ফুল ? কদম্ব সে বরষা-বিলাসী ?
অথবা কুণ্ঠিতা কন্যা অতসীর কোমল মুকুল ?

আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম-বিতানে।
বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্‌ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ।
লঘুপদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিঃশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাস্তব্ধ রাতের বাতাস॥

৩০ নবেম্বর ১৯২৮

দুর্লভ রাত্রি

এখন বাহিরে চলো। পাতাগুলি হাওয়ায় চঞ্চল
যেখানে, সেখানে চলো। মেঘে আজ হারায়েছে শশী।
চলো যাই বাগানের পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি,
বাতাসে উড়ুক্‌ চুল এলোমেলো, উড়ুক্‌ আঁচল।
তোমার চোখের 'পরে আঁধার করিবে ছলছল্‌,
তোমার চোখের মতো উছলিবে কাজল-সরসী,
তোমার পায়ের শব্দে কালো জলে উঠিবে হরষি',
জোনাকির ছায়াগুলি পরীদের মতো অবিকল।

বাহিরে চাহিয়া ছ্যাখো। আজ রাত্রি চমৎকার! নয়?
হয়তো এমন রাত্রি এ-জীবনে আসিবে না আর।
জানুক্ সকল লোকে, এতটুকু করি না কেয়ার,
কত ভালো লাগে আর ঔদাস্যের মিথ্যা অভিনয়!
নিঃঝুম নিশীথ এই জীবনের দুর্লভ সময়,
কুসুমিত অবকাশ দু'জনার কাছে আসিবার॥

২৮ জানুয়ারি ১৯৩০

একটি স্বপ্ন

তুমি এলে এতদূর! এতদূর এসেছো কখন?
কেমনে চিনিলে পথ রন্ধ্রহীন এমন অমায়?
ভাবিতেছিলাম আমি এতক্ষণ কেবল তোমায়।
তোমারেই ভাবি রোজ একা-একা থাকি যতক্ষণ।
খুলে রেখে আসিয়াছ দু'হাতের মুখর কাঁকন?
এমন ছায়ার মতো আসিতে কি হয় নিরালায়!
এখনি ফিরিতে হবে? এলে শুধু দেখিতে আমায়?
এলে যদি এতদূর এ তোমার খেয়াল কেমন!

কথা রাখো, আজ আর এ-আঁধারে যেয়োনাকো ফিরে।
তুমি আজ ক্লান্ত বড়ো, বেশি কথা না-ই কহিলাম।
তবু তুমি যেয়োনাকো, এখানেই করো-না বিশ্রাম!
এমন নিঃঝুম রাত্রে যায় কেউ ঘরের বাহিরে?
একটুকু বসো আর; দেখিছ না ঘরের তিমিরে
তোমার কেশের গন্ধে ভাসিছে কী গভীর আরাম!

৩০ জানুয়ারি ১৯৩০

স্বপ্ন

কাল যে দেখেছি স্বপ্ন, অপরূপ! শুনিবে সে-কথা?
অপূর্ব কাহিনী সেই, চুপে-চুপে কহিব তোমায়।
সবাই ঘুমালে পরে এসো হেথা টিপি-টিপি পায়;
চঞ্চল কঙ্কণ-শব্দে ভেঙো না রাত্রির নীরবতা।
লতারে দেখেছি স্বপ্ন? পাগল! সে হ'তে পারে লতা?
যাহারে দেখেছি কাল, কানে কানে শোনো যদি তায়,
তা হ'লে খুশিই হবে। এসো কিন্তু গভীর নিশায়
অঞ্চল সংযত করি', আশঙ্কায় মৃদু-অবনতা।

ছ্যাখো, ছ্যাখো! মেঘ-ভারে দিবালোক হয়েছে মেদুর,
তরল তন্দ্রার মতো গৃহ মোর ছেয়েছে আঁধারে।
কখন্ আসিবে তুমি? রজনী, সে আরো কতদূর!
এ মোর ভোরের স্বপ্ন— এ কি কভু মিথ্যা হ'তে পারে?
ফুলের স্পর্শের মতো নয়নে যা লেগেছে মধুর,
তুমি ছাড়া হেন স্বপ্ন বলো আর কহিব কাহারে?

মার্চ ১৯২৯

গুরুজনদের মাঝে

গুরুজনদের মাঝে কথা কহিবাব অছিলায়
কহিলাম, 'এক গ্লাশ জল দেবে? পেয়েছে পিপাসা'।
যারে কহিলাম সে-ই বুঝিল কেবল মোর ভাষা,
তবু তার গাল দু'টি লাল হয়ে উঠিল লজ্জায়।
বোকা মেয়ে! জানে না তো গুরুজন-লোকের সভায়
কী ক'রে লুকাতে হয় হৃদয়ের এত ভালোবাসা।
যে-রক্তিম প্রেমে ওর পরিপূর্ণ প্রাণের বিপাশা,
একটি ঝলক্ তারি লেগেছে গালের কিনারায়।

ঘোর রাতে কতদিন ক'রেছি তো অনেক আদর,
নিরালায়, চুপে-চুপে। কত চুমা খেয়েছি কপালে,
কম্পিত চোখের 'পরে; কত বার কত যে খেয়ালে
কত ভাবে দেখেছি তো নিটোল, নিখুঁত রূপ ওর।
তবু এই লাজটুকু লাগিল কী অদ্ভুত সুন্দর,
গুরুজনদের মাঝে আলো-ভরা প্রকাশ্য বিকালে॥
১৯২৯

আকাঙ্ক্ষা

নাহি জানি তথাগত বুদ্ধের বচন সত্য কিনা —
পুনরায় জন্মলাভ আছে কিনা অদৃষ্টে আমার;
চার্বাকের তিক্ত বাণী, 'ভস্মীভূত এ-দেহের আর
পুনরাগমন নাই' সত্য কিনা সে-কথা জানি না।
এ-জীবন কাটে যদি অর্থ যশ কিম্বা মান বিনা,
তাহাদের তরে আমি জন্মলাভ চাহি না আবার,
নতুন বস্ত্রের মতো নব দেহ লয়ে বারম্বার
মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করি' পৃথিবীতে আসিতে চাহি না।

আমি শুধু এ-জীবনে আহরিতে চাই প্রাণ ভ'রে
তোমার সুন্দর প্রেম, তোমার সিন্ধুর মতো স্নেহ;
কাব্যে আহরিতে চাই সেই কথা, যাহা আর কেহ
কভু কহে নাই (অন্যে তব কথা জানিবে কী ক'রে ?)
এ-জীবনে তুমি থাকো —তারপর মরণের পরে
মোর কাব্যে অনশ্বর হয়ে থাক্ এ-জন্মের দেহ॥
৫ জানুয়ারি ১৯৩০

নাস্তিক

ঈশ্বর মানি না আমি, মানি শুধু মনের আদেশ ;
অস্তিত্ব-বিহীন সেই আস্তিকের মস্তিষ্ক-নিবাসী
মোর বিভীষিকা নহে। আমি নহি দাসত্ব-বিলাসী
জীবনেরে জানি আমি মরণের পাত্র-অবশেষ।
সত্য, আমি স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল ; কোমলতা-লেশ
নাহি মোর ; সত্য, আমি নাস্তিক দাম্ভিক তিক্তভাষী।
মানুষের মূর্খতায় বিদ্রূপে হাসিতে ভালোবাসি,
উপহাসি হৃদয়ের অর্থহীন বিষণ্ণ আবেশ।

তবু যবে ফিরে আসি সন্ধ্যা যাপি' তোমার সকাশে,
অন্যমনে সত্তাহীন ঈশ্বরেরে দেই ধন্যবাদ।
বিদ্রূপ-প্রদীপ্ত চোখে ভালো লাগে অশ্রুর আস্বাদ ;
অকস্মাৎ মনে হয়, পৃথিবীর অপূর্ব আকাশে
প্রেম ছাড়া কিছু নাই ; সেদিন নিশীথ-রাত্রে আসে
আমার কঠিন প্রাণে সুশীতল মধুর বিষাদ ॥

১৯২৯

প্যারাডাইজ্ লস্ট্

একদিন স্বর্গ হ'তে নামিলাম পাখা ভর করি'
মর্ত্যলোকে —কী বিচিত্র পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মিছিল !
অবাক বিস্ময়ে আমি দেখিলাম আকাশের চিল,
দেব-নেত্র বিস্ফারিয়া দেখিলাম সিন্ধুর লহরী।
দেখিলাম পৃথিবীর লাল ফুল, কালো বিভাবরী,
সবুজ গাছের পাতা, আকাশের সুগভীর নীল,
অন্তহীন জনস্রোত। দেখিলাম, সমস্ত নিখিল
চলেছে অস্থির-পদে অপূর্ব বিচিত্র বেশ পরি'।

অকস্মাৎ জাতুমন্ত্রে সে-মিছিল স্তব্ধ করি দিয়া
গৌরবে রানির মতো, মহীয়সী, তুমি এলে ধীরে ;
মুগ্ধনেত্রে চাহিলাম। তোমার তু'চোখের তিমিরে
লোষ্ট্র-সম সপ্তস্বর্গ ডুবে গেল মুহূর্ত কাঁপিয়া ;
পুণ্য-দেহ হতে মোর শুভ্র পাখা পড়িল খসিয়া,
নিভে গেল দেবত্বের জ্যোতিশ্চক্র দীপ্তানন ঘিরে ॥

১৯২৮

জ্বরে

যখন এ-পৃথিবীর নিঃসঙ্গতা করি অনুভব
তখন পরীর মতো লঘুদেহে বায়ু ভর করি' ;
তুমি আসো মোর পাশে নিশীথের ছায়া-পথ ধরি',
তুমি ছাড়া অর্থহীন জীবনের লক্ষ কলরব।
সহস্র-বান্ধব মাঝে তুমি মোর একান্ত বান্ধব,
নিদ্রা-রূপে তুমি মোর সাথে থাকো সুদীর্ঘ শর্বরী,
ফুলের গন্ধের মতো তুমি আছ সারা মন ভরি,
তথাপি জীবনে তুমি ঈশ্বরের মতন তুর্লভ।

আজ তুমি এসো কাছে দেবত্বের অপার দয়ায়।
ছাখো আজ কেহ নাই স্নিগ্ধ হাত মাথায় রাখিতে,
তু'দণ্ড বসিবে কাছে এমন কে আছে পৃথিবীতে ?
তোমার মতন দেবী, দয়াময়ী জগতে কোথায় ?
অসুখ-জর্জর দেহ, ঘুম নাই চোখের পাতায়,
একবার এসো কাছে আজি এই বিস্বাদ নিশীথে ॥

১৯২৮

বার্তা

আমার জগৎময় তুমি ছাড়া কিছু নাই আর,
মূর্ছার মতন তুমি মনোহর আমার নয়নে,
তোমার অঞ্চলভঙ্গে মৃদুগতি তোমার চরণে
আনন্দে শিহরি ওঠে পদতলে পৃথিবী আমার।
অমার বর্ষণ সম তোমার সুদীর্ঘ কেশভার
ধরিত্রী বিলুপ্ত করি' নামিয়াছে আমার ভুবনে —
কেবল একটি কথা মনে আজ বাজে গুঞ্জরণে,
তুমি ছাড়া এ জীবনে দুঃখের নাহিক মোর পার।

এ-কথা কহিব আমি লক্ষবার আকাশের কানে,
এ-কথা ছড়ায়ে দিব আজ রাত্রে প্রত্যেক তারায়,
বাতাসে ভাসাব আমি এই সত্য সমস্ত ধরায় ;
এ-কথা পাঠাব দূর স্বর্গ আব পাতালের পানে,
পৃথিবী নক্ষত্র স্বর্গ আজ রাত্রে সব যেন জানে
যে-কথা নিভৃতে বসি তোমারে কহিতে প্রাণ চায়॥

১৯৩০

এলিজি

আমি ডাকিলাম তারে নিশান্তের হাওয়াব ভাষায়,
চমকিয়া চাহিল সে মোর পানে শুধু একবার ;
তারপর ধীরে-ধীরে আঁখি নত করিল আবার,
শঙ্কিতা কুমারী যথা প্রত্যাসন্ন বিবাহ-নিশায়।
সন্ধ্যার সিন্দূর আঁকা দেখি তার সুন্দর সিঁথায়—
মূর্খ আমি —তবু, হায়, বুঝি নাই ইঙ্গিত তাহার ;
আবার ডাকিনু যবে, বাঁকাইয়া লঘুদেহভার
চাহিল সে মোর পানে আধো-স্নেহে আধো-ভর্ৎসনায়।

ধীরে ধীরে ঋজুদেহা দাঁড়াইল উঠি' তারপর,
গৌরবে রানির মতো, মহিমায় দেবীর মতন।
কহিল সে, 'বধূ আমি', তারপর করিল বরণ
অকলঙ্ক মরণেরে —অপূর্ব সে মৃত্যু-স্বয়ম্বর!
সে আজ কোথাও নাই। শূন্য গৃহ, অরণ্য, প্রান্তর,
তাহারে দেখিছে আজ একমাত্র মহান্ মরণ॥

১ মে ১৯৩০

শরৎ

আজিকে শরৎ বুঝি? তাই আজ আকাশ সুনীল,
বাতাস মধুর। তাই মর্ম মোর হয়েছে উন্মনা।
নিঃশেষে মুছিয়া নিল মোর সব মধুর কল্পনা
পিঙ্গল পালকপুটে আকাশ-বিহারী শঙ্খচিল।
আজ শুধু নীলাকাশ আর স্নিগ্ধ শারদী অনিল
আছে যেন; আমি নাই, নাই কোনো সুদূর বেদনা;
নয়ন-পল্লবে নাই সুশীতল অশ্রু এক কণা;
আজি যে শরৎ, তাই মন বুঝি হয়েছে শিথিল।

আমি যারে ভালোবাসি সে যদি থাকিত আজ পাশে,
তা হ'লে চাহিত সে-ও শরতের দূর নীলিমায়,
আজিকার নভোব্যাপী নীলিমার প্রগাঢ় মায়ায়
ভুলিয়া মিশিয়া যেত তারো মন শুভ্রশীর্ষ কাশে।
তা হলে বসিয়া দোঁহে উদাসীন দু'জনার পাশে
ভুঞ্জিতাম একসাথে শান্ত মৃত্যু শারদ-ছায়ায়॥

৭ অক্টোবর ১৯২৮

জীবনে বৈচিত্র্য নাই

জীবনে বৈচিত্র্য নাই, বৈরাগ্যে ভরেছে মোর হিয়া
সোয়াস্তি লাগিছে তিক্ত, ক্লান্ত মর্ম হয়েছে উদাস।
নীলিমায় আঁখি মোর হয়েছে প্রহত। বারোমাস
শান্তির মরণ ভুঞ্জি' সাধ গেছে উঠিতে বাঁচিয়া।
তুমি কি কহিতে পারো সে-অদ্রির পথের বারতা
যেখানে তুষার-মরু, ফুল যেথা কভু নাহি ফোটে ?
অথবা যেথায় মহা-আকাশের বিশাল তুলোটে
আঁধার অক্ষরে লেখা মৃত্যুর ভীষণ রূপকথা ?

অথবা সেথায় চলো মোর সাথে —যেথায় অরোরা
বর্ণের আলিম্প আঁকে বিজন ভীষণ মেরু-শিরে,
অথবা বাদাম ফলে যেথা রক্ত-সাগরের তীরে,
ছায়ায় ঘুমায়ে থাকে চিক্কণ-চিত্রিতা বিষধরা
আর বিচিত্রিতা চিতা ; ব্যর্থপ্রেমে যেথা তীক্ষ্ণ ছোরা
প্রিয়ের বুকের রক্তে লাল হয়, সেথা চলো ফিরে॥

মার্চ ১৯২৯

প্রার্থনা

জীবন জীবন-হীন, রুদ্ধ প্রাণ, অবরুদ্ধ আশা,
বর্ণহীন দ্যুতিহীন দিনগুলি বিরস মলিন,
এই মৃত্যু, হে ঈশ্বর, আর কত ? আর কতদিন ?
আর কত দীর্ঘ দণ্ড হেন তিক্ত মুক্তির পিপাসা ?
নির্জীব সুখের তরে উঞ্ছবৃত্তি, শান্ত ভালোবাসা,
আলস্য-নিষ্ফল চিত্ত, প্রাণ-পন্থা বৈচিত্র্যবিহীন,
হেন পুষ্প-কারাগারে আর কত রুধিয়া কঠিন
খেলিবে আমার সনে তুচ্ছ পণে জীবনের পাশা ?

কৈশোরে দেখেছি স্বপ্নে যে-বিচিত্র বিস্তীর্ণ ধরারে ;
সিন্ধুতলে মৎস্যকন্যা, গিরিশিরে গন্ধর্ব-নগরী,
সে-বিশ্ব ফিরায়ে দাও ! রেখো না আমারে রুদ্ধ করি'
দাসত্বসঙ্কীর্ণনেত্র মূঢ়তার কৌতুক-আগারে ।
নয়নে ফোটে না তারা মেঘকৃষ্ণ বন্ধ্যা অন্ধকারে,
উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া সঙ্গীত আসে না কণ্ঠ ভরি' ॥

১৯২৯

শুভলক্ষণ

আজিকে কবিতা-রসে চিত্ত মোর হয়েছে মন্থর,
মধুপূর্ণ মধুচক্র-সম সেই রসে ভরপূর,
অধরে লেগেছে যেন একবিন্দু সুরভি কর্পূর —
মুহূর্তেক মধুগন্ধা, স্বাদহীন তিক্ত তারপর ।
অকরুণ শুষ্ক চিত্ত আজি যেন নবজলধর,
চিতায় জ্বলিল কিবা বিধবার সিঁথির সিন্দূর ;
এখন লাগিছে ভালো ম্লান জ্যোতি শিশির বিন্দুর
চন্দ্রালোকে বিচ্ছুরিত —এই দণ্ডে পৃথিবী সুন্দর ।

এখন আসিতে যদি মোর পাশে সশঙ্ক লজ্জায়
লঘুপদে নতনেত্রে, অয়ি মৃতা স্পর্শলোকাতীতা,
তা হ'লে মুঠিতে বাঁধি' তব হিম ক্ষুদ্র কম-পাণি
উচ্চারিতে পারিতাম সেই মোর অনবদ্য বাণী
এই ক্ষণে মনে-মনে রচিনু যে-মধুর কবিতা
তোমারে স্মরণ করি' অপরূপ রুচির ভাষায় ॥

২২ ডিসেম্বর ১৯২৮

কবিতা

যথা যবে মুগ্ধা মাতা নত হয় শিশুর আননে,
অঞ্চল খসিয়া পড়ে, ব্যগ্র ওষ্ঠ বিস্রস্ত অলক,
তেমনি আমার মনে কবিতার নবীন জাতক
সমস্ত সত্তারে মোর মুগ্ধ মত্ত করিছে এ-ক্ষণে।
আত্মহারা চিত্ত এ-কী খেলা খেলে কবিতাব সনে,
আপন সৃষ্টির রূপ আপনিই ছ্যাখে নিস্পলক,
হৃদয়ে উদ্ভাসি' ওঠে কী-অপূর্ব আনন্দ ঝলক্
জীবনের সখ্য ভেদ যুদ্ধ-শান্তি পড়েনাক মনে।

দুর্গম পথের পান্থ যথা ক্লিষ্ট দেহ কোনোমতে
উষ্ণ-পান্থশালা মাঝে শয্যাতলে একান্তে এলায়ে
অর্ধেক তন্দ্রায় ভুঞ্জে সত্তাব্যাপী গভীর আরাম,
তথা দিবসের কর্ম-পরিক্লান্ত মলিন জগতে
প্রাণ যাপি', এ-মুহূর্তে আত্মামাঝে নিজেবে মিলায়ে
মনের উষ্ণতা স্পর্শে এ-আনন্দ আমি লভিলাম॥

২৭ জানুযারি ১৯২৯

ছায়াসঙ্গিনী

আজি অবকাশ নাই, তবুও কর্মের রুদ্ধদ্বার
তোমার মাধুরীস্রোত পারিল না রাখিতে রুধিয়া।
অকস্মাৎ কোথা হতে মনের দর্পণ উদ্ভাসিয়া,
তোমার স্মৃতির আলো কর্মতপ ভাঙিল আমার।
দাঁড়াও ক্ষণেক তবে —যতক্ষণ গুরু কর্মভার
অবকাশে লঘু হয়ে চিত্ত হ'তে না পড়ে খসিয়া —
যতক্ষণ তব স্মৃতি একান্ত আত্মার অর্ঘ্য দিয়া
না পারি ধরিতে, ততক্ষণ থাকো আড়ালে হিয়ার।

থাকো তুমি সূর্যতপ্ত যেন কোনো মধ্যাহ্ন আকাশে
কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ —স্নিগ্ধজ্যোতি আভাসে মলিন,
থাকো —যেন পূজাবাদ্যে ঝঙ্কারিত বায়ুস্রোতে ক্ষীণ
শিশুর কাকলীধ্বনি মধুস্রাবী, আসে কি না আসে।
কবি যবে কাব্য রচে কবিপ্রিয়া যথা তার পাশে
নীরবে মাধুর্য বহে, থাকো তথা সত্তায় বিলীন॥

২৭ জানুয়ারি ১৯২৯

প্রেম

মা-র কোলে মাথা রাখি নিরুদ্বেগ রাজশিশু-প্রায়,
যদি মরণের কোলে ঘুমাইয়া পড়ি ধীরে ধীরে,
ফুল ফল নীলাকাশ সব যদি ঘুমের তিমিরে
হয়ে যায় একাকার —সে কী মুক্তি! কী প্রশান্তি তায়!
পত্রের মর্মর আর ভ্রমরের গুঞ্জন যেথায়
সব শব্দ লুপ্ত হয়, সেই দূর মহাসিন্ধু-তীরে
বাতাসে চরণ ফেলি' একদিন যাই যদি ফিরে,
শেফালি-সুগন্ধি, কুহু-ঝঙ্কারিত মধুর নিশায়।

শুধু যদি পৃথিবীতে ফেলে রেখে যেতে নাহি হোত
শীতল হাতের স্পর্শ, এলায়িত চুলের সুবাস,
শিথান-কোমল বুক, কালো আঁখি অশ্রু-ভারানত,
সুন্দর সিন্দূর-বিন্দু, মুখ-পরে কবোষ্ণ নিঃশ্বাস।
যদি প্রেম নাহি হোত লক্ষ-লক্ষ পৃথিবীর মতো —
যদি প্রেম নাহি হোত তারা-ভরা সহস্র আকাশ!

ডিসেম্বর ১৯২৯

সে-খোঁজে কী কাজ

কাহার তমসা-ঘন নয়নের স্নেহের সিঞ্চনে
আমার অন্তর-বনে ফুটিল এ কবিতা-মুকুল—
সে-খোঁজে কী কাজ, বন্ধু ? তোমাদের অবসর-ক্ষণে
যদি তারে লাগে ভালো, সেই সত্য আর সবি ভুল।
শরতের শেফালিকা যদি ফোটে তোমার কাননে
কোন্ নীহারিকা হতে নীহারাশ্রু তারে জন্ম দিল —
সে-খোঁজে কী কাজ ?

আমার জীবন যদি তোমাদের সুন্দর নয়নে
দিয়ে যায় কোনোদিন আনন্দের দীপ্তরেখা আঁকি',
তাহারে গ্রহণ কোরো ফুল্লমুখে, শুধায়ো না মনে
সে-আনন্দ জোগায়েছে জীবনের কত বড় ফাঁকি।
তোমার প্রিয়ার শুভ্র বাহু-ঘেরা সোনার কঙ্কনে
তাহাবে মানালে ভালো, কত বহ্নি দহিল সে সোনা —
সে-খোঁজে কী কাজ ?

১৮ নভেম্বর ১৯২৭

আমি কি লুপ্ত হব

যে-পোকার পাখা তোমার কপালে পরায় টিপের ফোঁটা,
তব পীতবাস রাঙিয়াছে যত ঝরা-শেফালির বোঁটা,
যত ছোট কীট জীবন-লোহিতে পরালো আল্‌তা তব,
তাদের মতন তোমার মনে কি আমিও লুপ্ত হবো ?

তোমার শিয়রে শিহরি' শিহরি' যত শিখা হ'ল ছাই
সে-ভস্মশেষ কোনো কোণে কি গো কিছুই পড়িয়া নাই ?
সে কি নিশি-শেষে শুধু তব শ্লথ চরণ-ধূলিতে মিশে,
আল্‌তায় রাঙি' উদাস বাতাসে ভেসে যাবে দিশে-দিশে ?

ফাল্গুনে তব দীপ্ত আঁখিতে ফেলিবে কি আর ছায়া
বরষার স্রোতে ভেসে-যাওয়া শত মৃত জোনাকির মায়া ?
সুখতন্দ্রার মধুর স্বপ্নে কখনো ফুটিবে না কি
তোমারি লাগিয়া বিভাবরী-জাগা কোনো সকরুণ আঁখি ?

সাগরের বুকে আকাশ-আঁখির অশ্রুবিন্দু যত
ঝিনুক ঝাঁপিতে ঝলে না কি তারা সাঁঝের তারার মতো ?

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

জরাস্বপ্ন

এই যেন সত্য হয়, একদিন তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু—জরাশ্লথ, দুর্বল, পাণ্ডুর,
নিষ্প্রভ নয়ন মেলি' অর্ধস্ফুট, কম্পিত ভাষায়
উচ্চারিতে পারি যেন সমকণ্ঠে 'আজো ভালোবাসি'।

এ-দেহ কুৎসিত হবে, আকুঞ্চিত কপাল কপোল,
বিস্বাদ অধর ওষ্ঠ, ন্যুব্জ দেহ, তরল-তারকা,
যৌবন ঝরিয়া যাবে, শুধু যেন থাকে যৌবনের
একমাত্র অবশিষ্ট এই কথা—'আজো ভালোবাসি'।

২ ডিসেম্বর ১৯২৮

মালতী ঘুমায়

বৈশাখী হাওয়ার বেগে তারাগুলি কাঁপিতেছে
ক্ষীণ-শিখা প্রদীপের মতো,
—এখন বাহিরে রাত কত ?
নিশীথের হাওয়া আজ আফিমের নেশার মতন,
(মালতীর চুলগুলি চোখের পলকে চুমা খায়),
বাতাসে আসিছে ভেসে দূর হতে অস্পষ্ট গুঞ্জন,
(ঘুম এসে নয়নে জড়ায়)।
পত্রের মর্মর আর শোনা যায় বাতাসের স্বর,
নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে ক্ষুদ্র তারা, ক্ষীণায়ু প্রহর।
(ঘুম কি ভাঙিয়া যাবে কপালে রাখিলে হিম হাত ?)
—এখন বাহিরে কত রাত ?

একরাশ কালোচুল উতরোল এ-বাতাসে
একেবারে হ'ল এলোমেলো ;
—এবার বৈশাখী ঝড় এলো !
কাঁপিছে দালান কোঠা সমুদ্রের জাহাজের মতো,
(বাতাস সরায়ে দিলো লঘু হাতে বুকের আঁচল)
এখনি ঝাপটে ছিঁড়ে উড়িয়া পড়িবে তারা যত।
(শুভ্র বাহু, পাটল কপোল)।
বাতাসে আসিছে ভেসে জল-কণা ঘরের ভিতরে,
সমস্ত আকাশ এসে জানালার কাছে ভিড় করে।
(নেমেছে চুমার মতো ঘুম ওর পলকের 'পর)
—এলো কাল-বৈশাখীর ঝড় !

ঘুমন্ত দৈত্যের পুরী অকালে জেগেছে আজ,
রক্ষা নাই, নাই আর গতি,
(জেগে যেন ওঠে না মালতী।)
পাতালের যত নাগ আকাশে মেলিছে লক্ষ ফণা,
(সাবধানে সবগুলি জানালা দিয়েছি বন্ধ ক'রে),
এ কী হুলুস্থূল কাণ্ড! আকাশে যে গ্রহ রহিল না!
(আমি আছি বসিয়া শিয়রে)।
লক্ষ দৈত্য ব্রহ্মাণ্ডেরে ছিঁড়িয়া ফেলিছে কুটি-কুটি,
তুলিয়া ধরেছে তারা বিদ্যুতের মশাল দেউটি ;
আমি জানি, কার খোঁজে নাগদৈত্য ছুটিতেছে রাগে
(ভয়, যেন মালতী না জাগে)।

ওই শোনো দুড়্ দুড়্ লক্ষকোটি নাগদৈত্য
ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইছে ত্রাসে,
—মত্ত ঝড় শ্রান্ত হয়ে আসে।
শাখার উন্মাদ নৃত্য ধীরে-ধীরে হয়েছে মন্থর,
(বিদ্যুৎ গিয়েছে ছুঁয়ে মালতীরে কম্পিত চুমায়),
ঝাপটে ঝরিছে পাতা, স্বচ্ছ হয়ে আসে দিগন্তর,
(অপরূপ! মালতী ঘুমায়)।
শঙ্কিত ডানার নিচে পৃথিবীরে লুকাইয়া কোলে
আশঙ্কায় কাঁপে রাত্রি, দু'টি তারা ভয়ে আঁখি খোলে
(স্বপ্নে উঠিয়াছে কেঁপে মালতীর আরক্ত অধর)
—শ্রান্ত হয়ে এল মত্ত ঝড়।

মেঘমুক্ত স্বচ্ছাকাশে তারাগুলি ফুটিতেছে
শুভ্রদল শেফালির মতো
—এখন বাহিরে রাত কত ?
দেবতা নিক্ষেপি' বজ্র তাড়ায়েছে অমঙ্গল যত,
(পৃথিবী হয়েছে হিম মালতীর ঘুমের লাগিয়া) ।
এলায়ে পড়েছে রাত্রি নিদ্রাক্লান্তা মালতীর মতো,
(আমি আজ থাকিব জাগিয়া) ।
ঘুমায় দূরের বন, ঘুমে ঝরে কুসুমের জল,
ঘুমায় পাথার-পুরী, ঘুমাইছে ক্লান্ত দৈত্যদল,
(জাগিয়া উঠিবে না তো ধরি যদি ওর দু'টি হাত ?)
—এখন বাহিরে কত রাত ?

এপ্রিল ১৯৩০

একটি মেয়ে

আমাকে একটি মেয়ের খবর দিতে পারো ?
বলো তো একটি ছোট মিষ্টি মেয়ের কথা,
যে মেয়ের নেইকো রূপের একটু অহঙ্কারো,
মনে যার নেই কোনোরূপ গভীর ক্ষতের ব্যথা,
হাসি যার ঠোঁটের কোণায়, চোখের কালোয় আঁকা,
খুশি যার দেহের লীলায় ফুলের মতো ঝরে,
যে মেয়ে ঝর্ণা যেন, যায় না ধ'রে রাখা —
এনো তো সেই মেয়েটির খবর দয়া ক'রে ।

বৈশাখ ১৩৩৪

হিতোপদেশ

শোনো মোর কথা, কবিতা লিখিয়া সময় কোরো না মাটি,
খাতার পাতায় দখিন হাওয়ারে রেখো না বন্ধ ক'রে
চাঁদের আলো-কে কালো অক্ষরে রাখিতে যেয়ো না আঁটি',
ফুলের সুবাস বাতাসে জড়ায়ে উড়ুক যেমন ওড়ে,
যতখন তুমি জ্যোৎস্না এবং ফুলের সুবাস নিয়ে
কবিতা রচিবে, ততখন কোনো কুঞ্জে বসিয়ো গিয়ে।

তারার দীপ্তি মাটির গন্ধ ঘাসের শিশির কণা,
তোমার চোখে ও স্পর্শে যদিও লেগে থাকে খুব ভালো,
যদি সন্ধ্যা ও প্রভাতের আলো করেই অন্যমনা,
তন্ময় ক'রে তোলে যদি কভু খুদে জোনাকির আলো,
তাহ'লে বরং কবিতা রচনা ত্যাগ ক'রে যেয়ো ছুটে
যেখানে তারা ও শিশির-জোনাকি একসাথে আসে জুটে।

শরৎ আকাশে নেশা লাগে চোখে, বসন্তে প্রাণ দোলে,
সত্যই যদি এতটা কখনো ক'রে থাকো অনুভব,
যদি ফুল-ফল-তরু-লতা-নদী হৃদয় জাগায়ে তোলে
তবে সারাদিন সারারাত ধ'রে দেখো শুনো সেই সব।
কবিতা লিখিতে তারি মাঝ হ'তে ঘণ্টা কয়েক কাল
কোরো না নষ্ট, উপভোগে আর ডাকিয়ো না জঞ্জাল।

প্রিয়ার স্মৃতিটি তোমার হৃদয়ে গোলাপ কাঁটার ক্ষত
সে-কথা না হয় পাড়ায়-পাড়ায় নাই হ'ল জানাজানি,
প্রিয়ার বচন মনের মরুতে সুধার ধারার মতো.
সে গোপন কথা খাতার পাতায় নাই বা আনিলে টানি',
যতখন তুমি প্রিয়ার কথাটি ছন্দে গাঁথিবে কবি,
ততখন ব'সে মনের মুকুরে দেখিয়ো প্রিয়ার ছবি ॥

৪ আশ্বিন ১৩৩৩

ব্যর্থ কবি

আমি নহি সেই জাতি, সকলে পছন্দ করে যারে,
কূপে খণ্ডাকাশ-সম কালো চোখে দেখি নাই ধরা।
আমি নহি সেই কবি, যার স্নিগ্ধ নয়ন-আসারে
ধরণী জুড়াল হিয়া, অশ্রু নহে আমার পসরা।
আমি সে-ভিক্ষুক নহি, প্রেম যার কৃপণের কড়ি,
একদা লভিয়া দয়া তারি স্মৃতি পূজে আমরণ ;
সে-দীনতা মোর নহে, যার বশে উঞ্ছবৃত্তি করি'
কণিকা-জোনাকি দিয়া আলোকিব আঁধার-স্বপন।

আমি সেই অভিমানী, সঙ্গীরে যে দিয়াছে ফিরায়ে
মুহূর্তের অহঙ্কারে,—ঘৃণ্য কৃপা যে চাহে নি কভু ?
সে আমি —হেলায় প্রাণ দিয়েছে যে আকাশে ছড়ায়ে,
মৃত্যু নীল ঊর্ধ্ব হ'তে আয়ুভিক্ষা করে নি যে তবু।
আমি সেই ব্যর্থ কবি, যারে শুধু শুনেছে দেবতা
নীরবে দিগন্তে বসি', আশা-বধূ যেথা অবনতা ॥

১ ডিসেম্বর ১৯২৮

মানব

হে যাত্রী মানব,
তোমার পথের পাশে বাঁধিয়াছে বাসা তব
ভুলে-যাওয়া জীবনের মৃত্যুহীন শব
তাই আশ্বিনের ভোরে রৌদ্রস্নাত নীলাকাশ
স্বর্ণ-অঙ্গুলিতে
পৃথিবীর জলে-স্থলে যে-আনন্দ আঁকি দেয়
গভীর ইঙ্গিতে,
যে-উদ্দাম মুক্তি মত্ত বাতাসের প্রতিশ্বাসে
ডাকিছে তোমায়
উল্লাসে ছুটিয়া যেতে সেই মায়া-প্রাসাদের
হৈম দরোজায় —
থমকি' দাঁড়াও তুমি আতঙ্কে বিহ্বল-হিয়া
হে ভীত মানব,
তোমার পথের পাশে ক্রূর অট্টহাসি হাসে
তব জীর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন শব ॥

হে মুগ্ধ মানব,
তোমারে ঘেরিয়া তব পরিত্যক্ত জীবনের
কৃষ্ণকায় কঙ্কালেরা করে কলরব
বসন্তের স্নিগ্ধবায়ু উচ্ছ্বসি' উলসি' ওঠে
কোকিলের গানে,
ভ্রমরের গুঞ্জরণে সুপ্ত পুষ্প আঁখি মেলে
বিশ্বের উদ্যানে,
ধরিত্রীর উষ্ণশ্বাসে আনন্দ-কম্পন জাগে
আকাশের গায়,

স্বপ্নে-পাওয়া কেশ-গন্ধ মুহূর্তে ছড়ায়ে পড়ে
তারায়-তারায়,
তখন শিহরি' উঠি' সহসা নয়ন ঢাকো,
শঙ্কিত মানব,
তোমার বক্ষের পাশে দয়াহীন ক্রূর হাস্যে
কৃষ্ণকায় কঙ্কালেরা করে কলরব ॥

২৮ মাঘ ১৩৩২

রুদ্রলীলা

নৃত্যমত্ত বাসুকির কম্প্র ফণা'-পরে
ক্ষুদ্র মণিকার প্রায় বিষদগ্ধা ধরণী শিহরে।
ফণার নর্তন-ভঙ্গে উঠিয়াছে তরঙ্গ-পর্বত
দীর্ণ করি' জীর্ণ তরী চূর্ণ করি' ভগ্ন জলরথ ;
অরুণের শেষরশ্মি —উন্মাদ সাগর নিল তারে
বাসুকির বিষতপ্ত পাতালের নিদ্রিত কিনারে।
নাগের নিঃশ্বাসে হায়, সবে-পাতা খেলা যায় চুকি'—
উচ্ছ্বসিয়া উল্লসিয়া নৃত্য করে উন্মত্ত বাসুকি।

বাসুকির ফণাশীর্ষে ধরণী সে বিষদীপ্তা নীলা,
মুগ্ধ করে সত্য, তবু দগ্ধ করা —সে-ই তার লীলা।
কালকূট বহ্নিতেজে মহাকাশ দগ্ধ হয়ে যায়
মুক্তি-মরীচিকা-তীর্থ বালুতপ্ত মরুভূমি-প্রায়।
মানবের বক্ষ দোলে সর্পের গরল-বহ্নি তেজে,
দোলে পৃথ্বী বাসুকির ফণাশীর্ষে ক্ষুদ্র মণি সে যে ॥

মাঘ ১৩৩৩

ছায়া

কাল রাতে একলা আঁধার পথে সহরতলীতে
দেখ্‌লুম অদ্ভুত মেয়ে এক।
সেখানে অশথ ঝোপ নিঃঝুম ছবির মতন,
এতটুকু হাওয়া নেই, জোছনাও ফোটেনি তখন,
দেখ্‌লুম আকাশের ময়লা আলোতে
আব্‌ছা ছায়ার মতো মেয়ে এক।

যদিও বাতাস নেই, তবু যেন দেখ্‌লুম অদ্ভুত,
উড়্‌ছে হাল্কা চুল, উড়্‌ছে হাওয়ার মতো, আব্‌ছা।
যদিও জোছনা নেই তবু যেন দেখ্‌লুম অদ্ভুত,
পাপ্‌ড়ির মতো তার চোখের পলক নত, আব্‌ছা।
নিঃঝুম জটবাঁধা অশথের ঝোপের ছায়ায়
ওড়্‌নার মতো তার মুখখানি অর্ধেক ঢাকা,
দেখেছি অলক তার, দেখেছি পলক তার, আর
দেখেছি শরীর তার বাঁকা।

কাল্‌কে আব্‌ছা রাতে দেখেছি যে অদ্ভুত সহরতলীতে,
বিছানায় শুয়ে তাই ঘুম নাই চোখে এতটুক ;
যদিও ছিলো না হাওয়া, যদিও ওঠেনি চাঁদ কাল,
যদিও দেখি নি তার মুখ॥

২০ এপ্রিল ১৯৩০

মালতী

চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রি ; মালতীর দ্বারতটে আজ
ফুটিয়াছে পুঞ্জে-পুঞ্জে জবা আর মদালসা হেনা !
নয়নে কাজল তার, বুকে তার বাসরের সাজ ;
মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
হৃদয়ের পান্থশালে যার সনে সব চেয়ে চেনা,
কালি যে কয়েছে রাত্রে, 'প্রিয়ে লতা, অপরূপ তুমি',
আজি চৈত্র-পূর্ণিমায় আসিবে সে, হৃদয়ের দেনা
নিঃশেষে শুধিয়া যাবে আলিঙ্গিয়া, রক্তাধর চুমি' ;—
কালি রাত্রে কানে-কানে কয়ে গেছে আসিবে সে ;
জানে তাহা মুগ্ধা মর্ত্যভূমি।

আজি চৈত্র-পূর্ণিমায় মালতী দুলালো হীরা-দুল্,
সিন্দূর-বিন্দুর 'পরে সাজাইল সোনালিয়া টিপ্,
অলক দুলায়ে দিল, খোঁপায় গুঁজিল লাল ফুল,
সোনার প্রদীপ-ভাণ্ডে গন্ধতেলে জ্বালিল প্রদীপ।
চন্দন-অঙ্কনে স্নিগ্ধ স্তনযুগ —বিকশিত নীপ —
অতিসূক্ষ্ম হেমাঙ্কিত কাঁচুলিতে আবরিল সুখে,
দর্পণে হেরিল ছায়া বারম্বার, দেহ-মোহ-দ্বীপ
বিমুগ্ধা ধরণী-বক্ষে বিরচিল অসীম কৌতুকে,
অপরূপ মালতী সে —অধরে অমৃত তার, চুম্বন-কামনা তার বুকে।

চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শিল সে আপন অধর,
এইখানে চুমিবে সে —মালতী কাঁপিল সুখ-লাজে।
মালতী স্পর্শিল বক্ষে, স্থাপি সেথা আপনার কর,
হাসিয়া রাঙিল আর কহিল, 'এখনো এলো না যে !'

অগুরু-গুগ্‌গুল-গন্ধে বিথারিয়া দিল গৃহমাঝে
স্থরভির স্রোতস্বিনী ; আরবার দর্পণে নেহারি'
ভাবিল সে, 'হেন রূপ এখনো সে নেহারিল না যে,
কালি যে কয়েছে, তুমি অপরূপ !' কুন্তল বিস্তারি'
সৌরভ-মন্থর বায়ে, মালতী ভাবিল মনে ;
মালতী সে রূপক্লিষ্টা নারী।

প্রহর কাটিয়া গেছে। গেছে, তবু এখনো আকাশে
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ তেমনি উজ্জ্বল মদালস,
এখন না জানি কোন্ অর্ধস্ফুট কোরক বিকাশে,
সৌরভ-আশ্লেষে যার দেহ হল মদির অবশ।
আজিকে রজনীব্যাপী গোধূলি-লগ্নের মধুরস
আকাশে ক্ষরিবে ; আজি মধুরাত্রি না হইতে শেষ
অধরে লভিতে হবে তপ্ত তার অধর-পরশ ;
রূপসী মালতী তাই ধরিয়াছে অপরূপ বেশ।
মালতীর রক্তাধরে সহস্র চুম্বন কাঁপে, বুকে দোলে অনন্ত আশ্লেষ।

মালতীর গৃহাঙ্গনে পুঞ্জে-পুঞ্জে ফুটেছে চম্পক,
অনিন্দ্যা রজনীগন্ধা আর সন্ধ্যামালতীর ফুল,
ফুটিয়াছে রক্তাশোক লতার চরণ-অলক্তক ;
জোৎস্না-বর্ণা মালতীর দেহ আজ সৌরভে আকুল,
বিস্রস্ত বায়ুর স্রোতে লক্ষ পরী এলায়েছে চুল,
স্ফুরিতেছে বাম আঁখি তাহাদের ডানার বাতাসে,
আননে লাগিছে এসে পরীদের শিথিল দুকূল,
ঝরিছে শিশির-বিন্দু তাহাদের অতিলঘু শ্বাসে।
মালতীর গৃহোদ্যানে স্থপারির দীর্ঘ ছায়া ধীরে খর্বতর হয়ে আসে।

হেন চৈত্র-চন্দ্রিকায় আলোকের আবরণ-তলে
কুরূপা কোথায় কাঁদে কে জানে তা, কে করে সন্ধান ?
হেন মধুময় রাত্রে কত দুঃখ নামিল ভূতলে
কে তাহা গুণিবে আজ, কে শুনিবে পাতা-ঝরা গান ?
রূপসী মালতী আজ সব রূপ করেছে আহ্বান
আপনার দেহ-গেহে ; আজি রাত্রি শেষ নাহি হ'তে
বিশ্বের সে শ্রেষ্ঠ রূপে বিনিঃশেষে করিবে সে দান
রূপহীন পুরুষের রূপমুগ্ধ যৌবনের স্রোতে :
মায়া-লতা মালতী সে, তনুতে অমৃত যার, মৃত্যু যার নয়ন-আলোতে

রূপক্লান্তা মালতী এ-রূপভার বহিবে কেমনে ?
আকাশ প্লাবিয়া গেল, ধরণী মূর্ছিতা মোহাবেশে
সপ্তঋষি স্পন্দহীন দীপ্তির নিগূঢ় আবরণে,
অনন্ত আঁধার দোলে মালতীর মধুলিহ-কেশে ।
অঙ্গের মাধুরী-মোহ আপনার অসহ আবেশে
মদ্য-নেশা উৎসারিছে নিঃশ্বাসের পুষ্প-বায়ু-সাথে,
আজিকে ভরিতে হ'বে এই তনু চুম্বনে-আশ্লেষে,
রূপসী মালতী তাই সাজিয়াছে আজি চৈত্র-রাতে !
এমন সৌন্দর্য-ভার কেমনে বহিবে একা মালতী এমন পূর্ণিমাতে !

মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না,
রাত্রি-মধুচক্র হ'তে বিন্দু-বিন্দু ক্ষরিছে প্রহর ;
হৃদয়ের পান্থশালে যার সনে সব চেয়ে চেনা —
সেই জন হেরিল না মালতীর মধুর অধর ।

সে যদি না আসে আজ, মালতীর সৌন্দর্য-লহর
কে হেরিবে? কে কহিবে, 'অপরূপ তুমি, প্রিয়ে লতা'?
সে-জন না আসে যদি, তবে আজ কার বক্ষ-'পর
স্তন-নতা মালতী সে প্রেম-ভরে হবে অবনতা?
সে যদি না আসে আজ, হেন রাত্রে কানে-কানে
কে কহিবে প্রিয় মধু-কথা?

সে যদি না আসে আর আজিকার হেমাঙ্গী নিশিতে,
ষোড়শ-বসন্ত-ঘেরা পূর্ণিমায় পূর্ণিত যৌবন
তথাপি বৃথায় যেতে নাহি দিবে কভু অলখিতে,
রূপমূল্যে লবে পূজা, মালতী করেছে আজ পণ।
চম্পক-সুরভি-দিগ্ধ স্নিগ্ধ রাত্রি করেছে উন্মন,
মালতীর দ্বার-তটে পুঞ্জে-পুঞ্জে বিকশিত হেনা,
আজিকে লভিতে হবে বিমুগ্ধের মধু-আলিঙ্গন,
মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
চুম্বনে-আশ্লেষে আজ নিঃশেষে শুধিতে হবে পঞ্চদশ বসন্তের দেনা।

পলে-পলে কেটে গেল অতিদীর্ঘ অর্ধেক রজনী,
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ এখনো উজ্জ্বল নেশাতুর,
আবেগে হয়েছে গাঢ় মালতীর নয়নের মণি,
সৌরভ-আশ্লেষে তার মুগ্ধ দেহ মদির বিধুর।
আজিকে রজনী-ব্যাপী কামনার সুরভি কর্পূর
আকাশে ক্ষরিবে; আজ আসিবে না তাহারা কি কেহ
কামনা করেছে যারা রূপসীর চুম্বন মধুর —
কামনা করেছে যারা রমণীর রমণীয় দেহ?
এমন পূর্ণিমা রাত্রে রূপসী-প্রেয়সী-হীন যাহাদের শূন্যকক্ষ গেহ?

আজিকে এমন রাত্রে হেন নর নাহি কি জগতে,
জীবনে যে লভে নাই রূপসীর সঙ্গসুখ-সুধা ?
আর যার কামক্ষুব্ধ অভিশপ্ত যৌবনের স্রোতে
তৃণ-সম ভেসে গেছে রূপময়ী মধুরা বসুধা !
পঞ্জরের প্রান্তে যার উদ্বেলিছে আলিঙ্গন-ক্ষুধা —
তারা কেহ হেরিবে না মালতীর ইন্দুনিভানন ?
কেহ ভুঞ্জিবে না তনু-লতা তার —মধুরা মধুদা,
ষোড়শ-বসন্ত-রাত্রি যে-তনুরে করেছে উন্মন ?
বৃথা কি কাঁপিবে বক্ষে চুম্বন-বেপথু-মধু —স্তনযুগে উষ্ণ আলিঙ্গন ?

সৌন্দর্য-কামনা যার, তারি তরে রূপসী মালতী
আপনার দেহ-গেহে সব রূপ করেছে আহ্বান,
ষোড়শ-বসন্তে আর নামিবে না পূর্ণিমার জ্যোতি,
আজি রাত্রে তনু-সুরা নিঃশেষে করিতে হবে পান।
রূপসী মালতী আজ তনুলতা করিবে প্রদান
রূপহীন পুরুষেরে ;—আজি রাত্রে তথাপি তথাপি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ ব্যর্থতায় নাহি হবে ম্লান,
অমৃত তুলিতে হবে দেহ মথি’ মত্ত রাত্রি যাপি’।
মালতীর রক্তাধরে সহস্র চুম্বন দোলে, আলিঙ্গন বক্ষে ওঠে কাঁপি।

উড্ডীন ঋতুর লঘু স্বর্ণ-পর্ণ ভাসিছে হাওয়ায়,
মালতীর উষ্ণশ্বাসে হৈমাকাশে জাগিছে হরষ ;
মালতী ভুঞ্জিবে সুখে পুষ্পশয্যা পুষ্পিত নিশায়,
নিবিড় আশ্লেষে তনু করিবে সে শিথিল, অবশ।

ধরণীর শ্রেষ্ঠ রাত্রে ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ-রস
অনুচ্ছিষ্ট নাহি রবে, মালতী করেছে আজ পণ :
'আজি রাত্রি না নিবিতে মালতীর অধর-পরশ
লভিবে সে —কাম যার রূপসীর অধীর যৌবন।
মালতীর ছায়া-চোখে বাসরের স্বপ্ন জাগে, বুকে কাঁপে ছায়া-আলিঙ্গন।

মদির হেনার গন্ধে ক্লান্ত রাত্রি ধীরে ঢলে পড়ে ;
তথাপি পূর্ণিমা-চাঁদ রাত্রিশেষে তেমনি উজ্জ্বল।
প্রদীপ নিবিয়া গেছে,—যায় যাক্, নিশীথ-বাসরে
চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রে পুষ্প-শেজে প্রদীপে কী ফল ?
কুন্তল-কুসুম হতে ঝরে গেছে দু'টি রক্ত-দল,
বিমুগ্ধ পুরুষ আসি' তুলে লবে, হায় মুগ্ধ প্রিয় !
চোখে যদি নিদ্রা আসে, মোছে যদি চোখের কাজল,
স্বপ্নে যদি ম্লান হয় এণাক্ষীর কটাক্ষ-অমিয়
এমন মধুর রাত্রে, রূপমুগ্ধ হে কুমার, অপরূপ নারীরে ক্ষমিয়ো

মালতীর মায়াগৃহে চূত-শাখে ফুটেছে মঞ্জরী,
দ্রাক্ষার স্তবক-সম ফলিয়াছে স্বর্ণাভ খর্জ্জুর
উদ্যানে ক্ষরিছে মধু পুষ্প হ'তে বিন্দু-বিন্দু করি',
তনুমধ্যা মালতীর দেহ আজ সৌরভে বিধুর।
মালতীর জীবনের শ্রেষ্ঠরাত্রি হয়েছে আতুর
একটি চুম্বন-তরে, একটি গভীর আলিঙ্গন,
নিটোল যৌবন তার রূপ-মদ্যে আজি ভরপূর ;
আকাশে ও জ্যোৎস্না নয়, মালতীর সোনার স্বপন।
মালতী শুনেছে বাণী, আসিবে আজিকে রাত্রে তার জীবনের শুভক্ষণ

এখনো আকাশে আছে মধুরাত্রি ; মালতীর চোখে
শঙ্কিত চুমার মত শ্লথ নিদ্রা নেমে আসে ধীরে,
এলায়ে পড়িতে চায় উষ্ণ তনু মদির আলোকে,
বাসরের হৈম স্বপ্ন বাসা বাঁধে নয়নের নীড়ে।
নিদ্রার আশ্লেষে বাহু শ্লথ হয়, তনুলতা ঘিরে',
নেশায় নিঃশ্বসি' ওঠে পুঞ্জে-পুঞ্জে মদালসা হেনা,
ষোড়শ-বসন্ত-দিগ্ধ স্নিগ্ধ তার যৌবনের তীরে
মালতীর মায়াগৃহে হেন রাত্রি আর আসিবে না।
আজিকার মধুরাত্রে বিনিঃশেষে শুধিবে সে পঞ্চদশ বসন্তের দেনা।

গভীর আশ্লেষ-সম মালতীর সর্ব-অঙ্গ ভরি'
গাঢ় নিদ্রা নেমে আসে, তনুলতা শিথিল, মদির,
অর্ধ-নিমীলিত চোখে ম্লান হয় মধুরা শর্বরী,
আসন্ন মিলন-আশে বক্ষ তবু আকুল অধীর।
রূপসী মালতীলতা আপনার তনু-ব্রততীর
শিথিল অস্পষ্ট ছায়া আরবার হেরিল দর্পণে,
কহিল সে, 'না নিবিতে আজিকার মধু-রজনীর
হেমালোক —আসিবে সে, বক্ষ যার কাঁপে আলিঙ্গনে',
মালতী কহিল ধীরে : 'আজি রাত্রে আসিবে সে,
আমি যবে রহিব স্বপনে।'

লেগেছে লতার চোখে স্বপনের শিরীষ-পরাগ,
সজল নয়নে তাই পুষ্প-পুঞ্জ ছায়া হয়ে দোলে,
বাতাসে ভাসিয়া আসে পথিকের দূর-অনুরাগ,
মুকুরের প্রতিবিম্ব মিশে যায় চোখের কাজলে।

অর্ধ-হেমালোকে আর অর্ধ-স্বচ্ছ স্বপনের কোলে
মিশে যায় বুভুক্ষিত তনু-সনে হেমাঙ্গী রজনী,
বক্ষে আলিঙ্গন যার, কামনা যাহার মর্ম-তলে
মালতীর দেহ-তরে উষ্ণ হিয়া সে দেবে নিছনি।
আজি রাত্রি না নিবিতে মালতী লভিবে বক্ষে বিমুগ্ধের মত্ত বক্ষধ্বনি।

লতার মদির চক্ষে নিদ্রা-ছায়া গাঢ় হয়ে আসে,
শয্যার মালিকা যেন সর্প-সম মোহ বিচ্ছুরিছে,
আসিবে যে তারি তরে কামনার অলস-বিলাসে
দেহ হ'ল নিদ্রাতুর, বায়ু-সনে স্বপন ক্ষরিছে।
এখনো পূর্ণিমা-চাঁদ মদক্ষরা, সে-আলোর নিচে
রূপসী মালতী-তরে না জানি কে আসে পথ বাহি',
না জানি সে-মোহদীপ্ত নয়নের গাঢ়তার পিছে
অশান্ত কামনা কত উদ্বেলিছে মালতীরে চাহি'!
সার্থক করিবে লতা অপরূপ রূপ তার সেই কামনায় অবগাহি'।

মালতীর ছায়া-চোখে ধীরে-ধীরে নিবে আসে আলো,
চৈত্র-পূর্ণিমার চাঁদ তথাপি মদির মদালস,
মালতীর আঁখি হ'তে পুঞ্জ-পুঞ্জ কুসুম মিলালো,
মৃত্যুর মোহন স্পর্শে তনু তার শিথিল অবশ।
জ্যোৎস্না-সিক্ত হৈমাকাশে নিবে আসে চৈত্র-মধুরস,
তথাপি এ আজিকার মধুরাত্রি না হইতে শেষ,
অধরে লভিতে হবে বিমুগ্ধের অধর-পরশ,
রূপসী মালতী তাই ধরিয়াছে অপরূপ বেশ,
অপরূপ মালতী সে—অধরে চুম্বন যার, বক্ষে যার অনন্ত আশ্লেষ

রজনী সে মালতীর রূপ-ভার বহিবে কেমনে ?
আকাশ প্লাবিয়া গেল, ধরণী মূর্চ্ছিতা মোহাবেশে,
অস্তগামী হৈম চাঁদ স্পন্দহীন দিগন্ত-গগনে,
অনন্ত আঁধার কাঁপে মালতীর মধুলিহ-কেশে।
অঙ্গের মাধুরী-মোহ আপনার অসহ আবেশে
মদ্য-নেশা উৎসারিছে এ-বিশ্বের পুষ্প-বায়ু-সাথে,
মালতীর তনু পূর্ণ মরণের মদির আশ্লেষে,
বাসরের সাজ তার তনু ঘেরি' আজি চৈত্র-রাতে।
রূপসী মালতী কভু ব্যর্থ রাত্রি যাপিবে না এমন মধুর পূর্ণিমাতে॥

২৩ বৈশাখ ১৩৩৫

পাশাবতী

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে ত্বলিছে ময়ুরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কুঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা, কালো আঁখি সুদূরে উধাও ;
যে-দেশে পাষাণ-পুরী, মানুষের চোখের পাতাও
অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে,
হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও —

তাহ'লে, তোমারে কহি, সে দেশে যে পাশাবতী আছে,
মায়ার পাশাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীব কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান ;
সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তার মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান॥

১৯৩৪ ?

পাতালকন্যা

কুমার শুনেছে রূপকথা ;
সাপের নিঃশ্বাসে হিম পাতালের অবশ প্রাসাদে
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
নীল সোনালতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন ?

সাপের দেয়াল ছাদ, মণিকোঠা সাপের মণির,
লাল কালো ঝিক্‌মিক্ সাপদের শীতল বিছানা,
চুনির মণির মত লাল চোখ কাল্-নাগিনীর,
বাতাস বিষাক্ত সেথা, মানুষের সেথা যেতে মানা।
কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা, তাহারে ফিরাবে কোন জন ?

কন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ,
কন্যার বুকের পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলি,
সাপেরা মেলিয়া ফণা দূর করে গরলের তাপ,
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশলাখ ফণা ওঠে তুলি' ;
দশলাখ লাল-কালো ডোরাকাটা সাপদের মাঝে,
সোনার কন্যার শুধু মুখখানি বাহিরে বিরাজে।
কুমারের উদাসীন মন
সে-দেশে গিয়েছে উড়ে, তাহারে ফিরাবে কোন জন ?

গভীর সমুদ্র-তলে প্রবাল-দ্বীপের সীমা ছাড়ি',
তিমিরা যেখানে থাকে তারো নিচে সাপের দালান,
সাত-ডিঙা মধুকর যে-দূর সাগরে দেয় পাড়ি,
যেখানে সমুদ্র-তলে মরকত-মাণিকের থান,

তারো দূরে, তারো ঢের নিচে,
লক্ষ ফণা নিঃশ্বাসে দুলিছে,
একেলা সোনার কন্যা সেই দেশে অঘোরে ঘুমায়,
ঝিল্‌মিল্‌ ফণার ছায়ায়।
কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা, তাহারে ভুলাবে কোন জন ?

এমন অদ্ভুত রূপ আছে কোন্‌ রাজকুমারীর ?
এমন চোখের পাতা (কুমার দেখেছে স্বপ্ন তার)
পৃথিবীতে কার আছে ? কার আছে এমন শরীর ?
এমন প্রবাল ঠোঁট আছে কোন্‌ সম্রাট্‌-কন্যার ?
আর কোন্‌ কন্যা আছে যার খোঁজ কেহ নাহি জানে,
কুমার একেলা যাবে —পণ তার —যাহার সন্ধানে ;
তারি কাছে গেছে উড়ে কুমারের উদাসীন মন ;
তাহারে ফিরাবে কোন জন ?

১৯৩১

পরী

পরীতে বিশ্বাস কর ? দেখেছ কি মানুষ যখন
আঁধারে একাকী চলে পিছনে সে নাহি চায় ফিরে ?
পদশব্দ শোনে কার পিছে পিছে ছায়ার মতন ?
জানো কে পিছনে চলে মানুষের সে ঘোর তিমিরে ?
পরীতে বিশ্বাস কর ? পরী, যারা শীতল শিশিরে
সাঁঝ হ'লে মুখ ধোয় দিবসের ঘুম থেকে উঠে,
আকাশের সব তারা যে পরীরা নিয়ে যায় লুটে।

যদি তুমি কোনোদিন পাহাড়ের কিনারে কিনারে,
গভীর বনের পাশে, বিশাল মাঠের মাঝখানে
একা একা ঘুরে থাকো, তবে তুমি দেখিয়াছ তারে,
তাদের গলার স্বর তবে তুমি শুনিয়াছ কানে।
যদি তুমি সেথা গিয়ে বলে থাকো—'কে আছ এখানে ?'
'কে আছ এখানে' বলে তারা সব হেসেছে তখন,
তাদের হাসির শব্দে কেঁপেছে পাহাড় মাঠ বন।

এ-ধরা গভীর বন, নিশাচরী এখানে বিহরে,
অন্ধকারে পদধ্বনি নৃত্যমত্ত সহস্র পরীর,
এ-বনে পরীর মায়া মানুষের প্রাণ লয় হ'রে,
অমার হাওয়ার মত তাহাদের ছায়ার শরীর,
বাতাসে ঝরিয়া পড়ে, তাহাদেরি শ্লথ কবরীর
বিচ্যুত শেফালি ফুল উষালোকে ত্রস্ত পলায়নে —
চোখের মণির মত তারা আছে আমার নয়নে।

মদের নেশার মত তাহাদের বাসিয়াছি ভালো,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি উহাদের পায়ের নূপুর,
জানি ওরা নিশাচরী, তবু মোর নিশীথের আলো।
জানি ওরা মৃত্যু আনে, তথাপি সে-মরণ মধুর।
অস্পষ্ট ওদের রূপে প্রাণ মোর তবু ভরপুর ;
হে নির্জন-সহচরী, আমি যাবো তোমাদের সাথে
স্বপ্নের অরণ্য পথে, সঙ্গীতের তারা-ভরা রাতে !

যদি তুমি কোনোদিন পাহাড়ের কিনারে কিনারে
পদশব্দ শোনো পিছে, যদি কভু ছায়ার মতন
ছায়াঞ্চল ছ্যাখো এক পালক-কোমল অন্ধকারে,
জেনো তবে সেইখানে আছে মোর রাত্রির স্বপন।
বারবার ছুটে যাই ছিঁড়ে দিতে তন্দ্রা-আবরণ,
বারবার ঘুরি সেথা, যদি দেখা পাই কোনো ক্ষণে,
চোখের আড়ালে, তবু ওবা আছে মোর সাবা মনে ॥

১৯৩০

কালের পাখি

হে কালেব পাখি, শাদাকালো তুই পাখা
আমার কুটিবে একটু থামিবে না কি ?
দেখিছ না আজ আমার কুটির ঢাকা
নব ফাল্গুন-ফুলে, হে কালের পাখি !
কতদূরে তুমি যাবে ? কেন ? কোন্ দেশে ?
পাখা কি তোমার বিশ্রাম নাহি চায় ?
আজিকাব দিন হেথা থেকে যাও এসে
আমার বাগানে, আমার গাছের ছায়।

ইন্দ্রপ্রস্থ ভালো লাগে নাই বুঝি ?
ভালো লাগিল না মগধ-কাঞ্চী-কাশী ?
মনের মতন দেশ মিলে নাই খুঁজি ?
বাঁধেনি তোমারে অশ্রু কিম্বা হাসি ?
রাবণ যখন ভুবন করিল জয়
তোমারে সে কেন বাঁধিল না ফাঁদ পেতে ?
গাণ্ডীব ধনু, তূণ যাঁর অক্ষয়,
পার্থ তোমারে ছেড়ে দিল চলে যেতে ?

হে কালের পাখি, শাদাকালো তুই পাখা,
যেয়ো না যেয়ো না আমার কুটির ছাড়ি,
ছাখো, ফুলে আজ আমার কুটির ঢাকা,
শুধু একদিন থেকে যাও মোর বাড়ি।

৩ ডিসেম্বর ১৯৩৪

রাঙা সন্ধ্যা

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে যায়।

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হ'তে দূর —তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মত্ততা।

চলে যায় তারা চোখের আড়ালে, লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
পাখার ঝাপট, বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্জন ?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে তারা কোন্‌খানে ?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন ?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো যদি যাই সন্ধানে ?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল, পাখার শব্দ ক্ষীণ।
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন ক্ষমাহীন॥

১৯৩৫

মাছেরা

কেঁপে কেঁপে ওঠে জল, কে তারে কাঁপায় ?
উপরে বাতাস, আর নিচে তার রূপালি মাছেরা।
রূপালি মাছেরা খেলে, কাঁপে জল সে-ডানার ঘায়,
ছোট বড় ঝক্‌ঝকে শত শত রূপালি মাছেরা।

চক্‌চকে আঁশে ঢাকা মাছগুলি ঘোরে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাথা তুলে একবার দেখে.নেয় সুনীল আকাশ,
তার পর ডুব দিয়ে চলে যায় প্রবালের দেশে —
ঝিনুকের শাদা কোলে সেই রাজ্যে মুক্তারা ঘুমায়।

ছোট মাছ বড় মাছ পাশাপাশি ছুটে চলে যায়,
নীলাভ ঢেউয়ের 'পরে, পাতালের নিথর শীতলে,
তাদের ডানার নিচে সপ্তসমুদ্রের নীল জল,
তাদের নিঃশ্বাসে কাঁপে আকাশের নক্ষত্রের ছায়া॥

১৯ নভেম্বর ১৯৩৪

পুলিশ

নিঝুম্ নিশুতি রাতে যখন ঘুমায়ে থাকে কবি,
নবোঢ়া ঘুমায় যবে, নব-প্রেম-মুগ্ধা ঘুম যায়,
নক্ষত্র-খচিত-কেশা শর্বরীরে কে দেখে তখন ?
নিদ্রার গুণ্ঠণ তুলি' ধরা পানে কে তখন চায় ?
তখন সে শিহরিত ছায়ার আড়ালে
চকোর ফুকারে যদি, দোয়েলায় দেয় যদি শিস্,
কান পেতে শুনে ভাবে দূরে কোথা-হুইস্‌ল্ বাজে —
একমাত্র জাগরূক রাস্তার পাহারা পুলিশ।

দেখে না সে আকাশের জ্যোৎস্নার জরির ওড়্না
শ্লথ হয়ে খসে গেছে নতজানু মর্তকরপুটে,
দেখে না সে ফুলগুলি সহসা মেলিতে চায় ডানা
দিবসের নিদ্রা হতে তারার চুম্বনে জেগে উঠে।
জানে না সে ঘাসগুলি শিশিরে হয়েছে মখ্‌মল,
বাতাসে ঝরিছে পাতা, তার সে রাখে না কোনো খোঁজ,
তবুও নিশীথ রাত্রে নিদ্রিত ধরার প্রতিনিধি
পুলিশ একাকী জাগে রোজ।

শরতের শিশিরের কণাগুলি ঝল্‌মল করে
চুনির মণির মত চাঁদের আলোর নিচে নিচে,
পুলিশ তাকায়ে ভাবে নিশ্চয় রক্তই হবে,
খুন ভেবে শশব্যস্ত হয়ে ওঠে মিছে?
রাত্রির বিজন বনে পরীদল খেলা করে রোজ,
গাছের পাতারা ডেকে কথা কয়, পাখি দেয় শিস্‌,
তার মাঝে সারারাত চোরের ভাবনা ভেবে জাগে
রাস্তার পাহারা পুলিশ!

১৯৩৬?

অহল্যার শুক্লাপাঙ্গে পলক-প্রচ্ছায়ে
মনোভব পাতিয়াছে শিথিল শয়ন
দ্বিপ্রহরে। মহাতপা গৌতম ঋষির
পুণ্য তপোবন আজি নিদাঘ দিবার
আপক্ক ফলের গন্ধে, পুষ্পিত তরুর
আন্দোলিত শাখার বীজনে আমন্থর।

অবিদূর খর্জুর-কাননে ফলিয়াছে
স্বর্ণাভ খর্জুর, দূরে আম্র-বাটিকায়
নব আম্রমুকুলের মধুর আঘ্রাণে
দলে দলে উড়িতেছে মধুমক্ষিদল
উন্মত্তের মত।

শান্ত আশ্রম কাননে
অশ্বত্থ ছায়ায় পাতি অর্ধ-বস্ত্রাঞ্চল
অহল্যা চাহিয়া ছিল আবিষ্ট নয়নে
পারাবত-মিথুনের পানে। স্বপ্নময়,
হেন দ্বিপ্রহরে দূর দিগন্তে চাহিয়া
দেখা যায় স্মর-সখা হৈম বসন্তের
স্বর্ণ পর্ণ, অলকে কপোলে আসি লাগে
উড্ডীন ঋতুর মৃদু ডানার বাতাস।

আর্যপুত্র তপোধন গেছে অবগাহে
বহুক্ষণ, স্নান অন্তে অর্ঘ্য বিরচিয়া
গঙ্গোদকে, ঋষিবর নিত্য পূজা করে
সহস্রাংশুসমপ্রভ দেব সবিতায়।
তারপর ক্রমান্বয়ে করি আবাহন
ইন্দ্রাগ্নী বরুণ আর দ্যাবা-পৃথিবীরে
কুটিরে আসেন ফিরে অহল্যার কাছে
মহর্ষি গৌতম মহাতপা। ততক্ষণে
আকাশে মলিন হয় দেব সবিতার
চম্পক-কুট্মলনিভ উজ্জ্বল কিরণ।
ততক্ষণ অহল্যার সারা দেহ ঘেরি
চূত আর চম্পকের মিলিত আঘ্রাণ

উন্মত্ত সর্পের মত জড়ায়ে রহে না
তীব্র আলিঙ্গনে, তীক্ষ্ণ রসনাগ্র মাখি'
বসন্তের বিষমোহ জর্জর করে না
তনু দেহ, আবেশ আনে না নেত্রপাতে।

মহর্ষি গৌতম মহাতপা ; স্বর্গ আর
মর্তলোক তাঁর কাছে করতলগত
আমলক সম। স্বর্গ কিম্বা রসাতল
তাঁর অবিদিত নহে। ত্রিকালজ্ঞ যেই
নখাগ্রে গণিতে পারে নক্ষত্রনিচয়,
সেও হায়, শঙ্কিত প্রকাশভীরু ম্লান
রমণীর হৃদয়ের গোপন কামনা
জানিতে পারে না। সবিতার নভোব্যাপী
রশ্মির গণনা করি নয়ন যাহার
জ্বলন্ত উজ্জ্বল, তুচ্ছ রমণী হিয়ার
ক্ষীণ আর্তি তাঁর চোখে ভস্ম হয়ে যায়।
তথাপি, ঈশ্বর জানে, অহল্যা মানবী।
রক্তমাংস বিনির্মিত এ দেহ-মন্দিরে
অগণন দেবতার সাথে বিহরায়
সে কিশোর কুসুমেষু, যাহার আদেশে
নরনারী সৃষ্টি করে নব জনস্রোত।
ঈশ্বর জানেন, জানে দেব মনোভব
অহল্যার দুঃখের নাহিক পরিসীমা।

সর্বনারীরূপশ্রেষ্ঠা অহল্যার কথা
কে না জানে? সর্বদেব নয়ন-রশ্মির
সম্মিলিত তেজে ধরার বসন্ত লয়ে
বৈজয়ন্ত ধামে উদিল যে, কে সে নারী?

অহল্যা, অহল্যা সেই জানে সর্বজন।
তথাপি এ বসন্তের দিনে, জনহীন
বনানীর অন্ধকার কোণে অহল্যারে
কে দেখিল ?   কে কহিল, সর্বশ্রেষ্ঠা নারী
অহল্যা ?   কোথা সে প্রিয় ?

সহসা চকিয়া
অহল্যা দেখিল চাহি, শ্যাম বীথি মাঝে
শুষ্ক মর্মরিত পত্রপুঞ্জ পায়ে দলি'
আসিছেন আর্যপুত্র মহর্ষি গৌতম
তপোনিধি।   সবিতার অরুণ-কিরণ-
আশীর্বাদে দীপ্ত ভাল, প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল
দু'নয়ন, সুগভীর বলি-রেখাবলী
দীপিছে ললাট মাঝে, যেন প্রতিভার
স্বহস্ত স্বাক্ষর।   এক হাতে বহিছেন
গঙ্গোদক কমণ্ডলু, আর অন্য হাতে
সিক্ত পরিধেয় বাস, গৈরিক উত্তরী।
আজি কেন গৌতমেরে অহল্যার চোখে
মনে হয় সৌম্যতর, ভাস্বর, সুন্দর
সর্বপ্রিয়তম ?

ধীরে আসিলা গৌতম।
প্রসারিত হস্তসম অশ্বত্থ শাখায়
রাখিয়া উত্তরী-বাস বাম বাহু হ'তে,
কমণ্ডলু রাখি আঙ্গিনায়, কহিলেন
সৌম্যমূর্তি, "প্রিয়তমে, পবন মন্থর
আজি, বহে না সে স্তুতি দেবতাসকাশে,

গঙ্গা শিথিলগামিনী, আর বিভাবসু
অন্যমনা। অসময়ে তাই আজি প্রিয়ে
এসেছি করিতে যাচ্ঞা তোমার সমীপে
জগতের শ্রেষ্ঠ কাম্য সান্নিধ্য তোমার।"

যৌবনের জন্মদিন হ'তে কোন্ বাণী
অহল্যা গেঁথেছে বসি' দীর্ঘ রাত্রি জাগি'
প্রহরের কৃষ্ণ-সূত্রে অতি সঙ্গোপনে?
কোন্ কথা এখনি কহিয়া গেল কাণে
দক্ষিণের মদোন্মত্ত বায়ু? আর্যপুত্র
কেমনে জানিল?

তখন সে কোন্ ঋতু?
তখন ফাল্গুন মাস, যে কুসুম-মাসে
এক পাত্রে প্রিয়াসহ মধু করে পান
উন্মত্ত দ্বিরেফ; যেই সুতীক্ষ্ণ ঋতুর
শরাঘাতে মহাযোগী হিমাদ্রিনিবাসী
আদিদেব রুদ্রতপা কঠোর ধূর্জটি
পার্বতীর মুখে চাহে মেলি ত্রিনয়ন
পলকবিহীন।

তবু যদি বসন্তের
কোমল পালক অহল্যার চক্ষুপাতে
না লাগিত, যদি স্মর মকর-কেতন
নাহি হ'ত ইন্দ্রাধীন, অহল্যা তা'হলে
দেখিত, সে লাবণ্যমণ্ডিত বরবপু
ক্রূরকর্মা তপোধন গৌতমের নহে।
কিন্তু তবু তপোবনে বসন্ত তখন,
কিন্তু তবু মনোভব বৃত্রারি অধীন!

অহল্যা ! পাষাণী নারি ! পাষাণের নিচে
প্রাণ আছে ? শোনো না কি দক্ষিণ পবন
চিরন্তন যৌবন-স্তম্ভিত শুভ্র তব
পাষাণ দেহের দ্বারে আছাড়ি' পড়িছে,
আজি পুনঃ ? ছ্যাখো না কি নিদ্রিত পুরীর
অভ্যন্তরে পশি কুমার বসন্ত ঋতু
বুলায় সোনার কাঠি ধরিত্রীর চোখে
মৃদু লঘু করে !

অহল্যা কহে না কথা।
মৃত্যুহীন কাব্য সম পাষাণে অটুট
যৌবন-সৌন্দর্য তার নিষ্পলক চোখে
চেয়ে রয় আকাশের শূন্য এক কোণে,
সমস্ত শর্বরী যেথা গভীর আঁধারে
একটি প্রদীপ্ত তারা জ্বলে অনির্বাণ,
আকাশের একমাত্র উজ্জ্বল তারকা ॥

১৯২৯

সনেট্

একবার মনে হয়, দূরে বহুদূরে, শাল তাল
তমাল হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়া ম্লান-দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোনো দিন এসে
আঁখি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে ;
মোদের জানালা পথে বয়ে যাক্ পৃথিবীর স্রোত।
সে-স্রোতে কখনও যদি ভেসে আসে নীলাভ-শরৎ,
তোমার চোখের কোলে, মেঘ যদি কভু মোহ আনে,
সে চোখে আমার পানে চেয়ো তুমি অকস্মাৎ থামি'॥

১৯৩৬

হিব্রুর ছায়ানুসরণে

তোমার মুখের চুমা পাই যেন, হে মোর সুন্দর!
মধুর তোমার প্রেম, সুরার চেয়েও মোহময়।
হে মোর আত্মার সখা! কেমনে তোমার পরিচয়
ওদের বোঝাবো আমি? তুমি ভাষাতীত মনোহর!
তুমি যেন রাজরথে বিশাল উদ্দাম খরতর
অশ্বদল ; তুমি যেন শান্ত সিন্ধু মুক্তার আলয় ;
তোমার বাহুতে আমি পরাইব সোনার বলয়,
দোলাব মুক্তার মালা, আমি তব বুকের উপর!

চন্দনের মাল্য তুমি, আমার বুকের মাঝখানে
আমারে জড়ায়ে থাকো সারারাত নিবিড় গভীর!
হে সুন্দর, সুশীতল! ঘাসে যেথা পড়েছে শিশির
তরল মুক্তার মত, আমাদের শয়ন সেখানে ;
বটের নিবিড় ছায়া সেখানে গভীর শান্তি আনে,
মাধবীর ঘন ছায়ে সেথা হয় নিঃশ্বাস মদির!

বনের গোলাপ আমি, পদ্ম আমি শীতল দিঘির ;
সবার প্রেমের মাঝে মোর প্রেম বনের কমল।
প্রিয় মোর বনস্পতি, শ্যামচ্ছায়া সুস্নিগ্ধ শীতল,
আপেল গাছের মত ফলভারে আনত-নিবিড়।
তাহার ছায়ায় আমি লভিয়াছি প্রশান্তি গভীর,
আমি জানিয়াছি কত মধুর-আস্বাদ তার ফল ;
'শারণে'র যত মেয়ে তার মাঝে আমি শতদল,
আমার প্রিয়ের মত কেহ নয় মহানগরীর।

মোরে সে রেখেছে বেঁধে ডান হাতে বক্ষের সম্পুটে,
আমার মাথার নিচে বাম বাহু রেখেছে সে তার ;
ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে! শপথ আমার,
আমার প্রিয়ের ঘুম, দেখো যেন নাহি যায় টুটে ;
শান্তজলে তারকার ছায়া সম উঠিয়াছে ফুটে
যে-স্বপ্ন আমার চোখে, ভাঙিয়ো না সে-স্বপ্ন সোনার॥

১৯৩৮

সন্ধ্যার প্রার্থনা

"ওরে মেয়ে, দেখ্ দুয়ারে কিসের ধ্বনি!
নিথর রাত্রে কাঁপিছে বন্ধ দ্বার।"
"ও কেবল মাগো বাতাসের রণরণি,
উতল হাওয়ায় বৃষ্টির ঝঙ্কার।
জানালার কাঁচে আছাড়ি' পড়িছে শ্রাবণের জলকণা ;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হয়ো নাকো,
আমি পড়ি বসে মোমের আলোয় সন্ধ্যার প্রার্থনা।

—ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে, জাগো রাত্রিতে আজ,
ওই শোনো বাজে বন্ধুর মোর গভীর পদধ্বনি,
শোনা যায় তারে নিশীথ আঁধারে নীরব মাঠের মাঝ,
সিক্ত অলকে ভূষণ তাহার বৃষ্টি কণার মণি।"

"ওরে মেয়ে, শোন্ কে যেন এসেছে ঘরে,
পায়ের শব্দ শুনেছি সিঁড়ির দিকে।"
"ও কিছু না মাগো ইঁদুরে আওয়াজ করে,
কিম্বা হয়তো খেলা করে চামচিকে।
জানালার পরে অবিরল ঝরে ঝর ঝর জলকণা ;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হয়ো নাকো,
আমি পড়ি বসে একেলা এ ঘরে সন্ধ্যার প্রার্থনা।
—ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে আসিছে বন্ধু মোর,
আসিছে সে ওই সবুজ আঙুর-আনত বনের থেকে,
ডুমুর যেথায় পাকিছে এখন সেথা থেকে প্রিয় মোর
একা মোর সাথে রাত্রি যাপিতে আসিতেছে পথ দেখে।"

"ওরে মেয়ে মোর, ভূতে ভয় পেলি বুঝি ?
তোর ঘরে যেন শুনি চরণের ধ্বনি।"
"ভূতেরা আজিকে পাবে না আমারে খুঁজি,
দেবদূত কাছে আসিল যে এক্ষণি।
জানালার 'পরে ঝর ঝর ঝরে অবিরল জলকণা ;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হয়ো নাকো,
আমি পড়ি বসে সারা মন দিয়ে সন্ধ্যার প্রার্থনা।

—সুন্দরতম, সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রিয়তম প্রিয় মোর,
বক্ষে আমার শোনো উত্তাল রক্তের মত্ততা,
সকল নয়ন নিদ্রিত, সব ঘরে আঁধারের ঘোর
ওগো নগরীর প্রহরী, কোরো না বিশ্বাসঘাতকতা।"

১৯২৮ জার্মাণ কবিতা থেকে

একটি কবিতার টুক্‌রো

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল উদ্দাম,
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।

জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না;
শুক্লকৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কাল বিহঙ্গম উড়ে যায়
অবিশ্রান্ত গতি।
পাখার ঝাপটে তার নিবে যায় উল্কার প্রদীপ,
লক্ষ লক্ষ সবিতার জ্যোতি।

আমি সেই বায়ুস্রোতে খসে-পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত;
সে-আকাশ তোমার অন্তর,
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর ॥

১৯৩৪

বাড়ব

কামনার সিন্ধুশৈল রুক্ষ কৃষ্ণ ভীষণ উষর —
বায়ুহীন শীর্ষে তার সঙ্গীহীন দাঁড়াইনু আসি ;
যতদূর দৃষ্টি চলে ঘনকৃষ্ণ কুন্তলের রাশি
শ্যাম দেহ-দ্বীপ ঘেরি রচিয়াছে উত্তাল সাগর।
সৌরভের মহারোলে দেহ মোর কাঁপে থরথর ;
বাতাসে আমার মুখে কেশসিন্ধুকণা আসে ভাসি' ;
অনন্ত নাগের মত লক্ষ মুখে নিতে চায় গ্রাসি'
আমারে সে কেশ-সিন্ধু —লুব্ধ, কৃষ্ণ, মহাভয়ঙ্কর।

অকস্মাৎ সিন্ধুবক্ষে জেগে ওঠে প্রলয়-কম্পন,
মুহূর্তে টুটিয়া পড়ে পদনিম্নে কঠিন-পর্বত
ভঙ্গুর স্ফটিক সম বিচূর্ণিত লক্ষ কণিকায়,—
সহসা আমার দেহ দগ্ধ করি' লেলিহ প্রভায়
আমারে গ্রাসিয়া লয় ভীষণ বাড়ব বহ্নিবৎ
কেশসিন্ধু গর্ভ হতে অগ্নিপ্রভ আরক্ত আনন ॥

১৯৩৪

আরেক রাত্রিতে

সবচেয়ে বড় গোলাপ যেখানে ফোটে
ওড়ে যেথা প্রজাপতি,
তমাল-শ্যামল ছায়া-সুশীতল যেথা
কুসুমিত বসুমতী,
পাতার আড়ালে পাখি করে কলরব,
হাওয়া ছুঁয়ে যায় চুল,

যেথা হ'তে কেউ কুড়ায়ে যায় না লয়ে
ছড়ানো শুষ্ক ফুল,
ম্লান জ্যোৎস্নার আব্‌ছা আলোয় যেথা
চাঁপা ফুল হয় পরী,
বাতাস যেখানে স্তবগুঞ্জন গায়
শোনে যেথা শর্বরী,
ঋতু বসন্তে চঞ্চল কুসুমেরা
ডাকে যেথা ইশারাতে
তুমি আর আমি যাব সে মধুর দেশে
দোঁহে মিলি এক সাথে।

কিন্তু যেখানে গভীর অন্ধকারে
ভয়াবহ নির্জনে
ক্লান্ত জীবন নীরবে খেলিছে পাশা
কঠোর মৃত্যু সনে,
শুষ্ক বনানী রিক্তপত্র যেথা
জীর্ণ দেবতাবাস,
যেথা অচকিতে কপালে আসিয়া লাগে
মৃত্যুর হিম শ্বাস,
তারকা যেখানে চুপে চুপে কথা কয়
ভীতা কল্পনা সনে,
দৈত্যের মতো ভাবনার দল যেথা
খেলে প্রমত্ত মনে,
বিদ্যুৎসম ভয়াবহ মহাকাল
যেথা দিয়ে যায় দেখা,
সে-ভীষণ দেশে যখন ভ্রমিতে হবে
সেথা আমি যাব একা॥

জানুয়ারি ১৯৩০

মিস্ —

কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙো ! ও কেবল ভূষণ তোমার
বারবার সকলের চোখের উপরে তাই বুঝি
সেই তব কলঙ্কের ঐশ্বর্যের মহামূল্য পুঁজি
ঢঙে আর ন্যাকামিতে নানাভাবে করিছ প্রচার।
দ্রৌপদীর কথা ভাবি মনে আনিয়ো না অহঙ্কার
উষাকালে তব নাম মানুষ স্মরিবে চোখ বুজি,
দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজি,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনির্বাণ স্মরণীয়তার।

কলঙ্ক-ভূষণ খোলো ! বহু-প্রেম-গর্ব যদি চাহ —
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে
দ্যাখো তবে পার্থ-ভীম-যুধিষ্ঠিরে, পঞ্চ পাণ্ডবেরে ;
যে-কলঙ্কে লুব্ধ করি' বহু হতে বহুতরদেরে
ঈর্ষায় টানিতে চাও, সে-ভূষণ নারীরে না সাজে,
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ ॥

ডিসেম্বর ১৯৩৫

ন খলু ন খলু বাণ

সংহত করো, সংহত করো অয়ি,
যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর,
এ নহে তন্দ্রা-অরণ্য-ছায়াচারী
ত্রস্ত হরিণ, সংহরো তব শর।
তীক্ষ্ণ সায়ক দীপ্ত এ-দিবালোকে
ভ্রষ্টলক্ষ্য কোনোমতে হয় পাছে,
শক্তি তোমার সংহত করো অয়ি,
মৃগয়ারো তরে ভিন্ন সে ঋতু আছে।

গর্বিতা অয়ি বলয়-শৃঙ্খলিতা,
মুহূর্ত ভোলো বন্ধন-কৌশল,
চোখে থাক্ মোহ, হে মোহ-দুর্বিনীতা,
বহুছলময়ি, আঁখি হোক ছল ছল।
চিত্ত আমার স্তব্ধ সরসী-সম
শুধু ছায়াখানি বক্ষে রাখিব এঁকে,
সুকঠিন মম মর্মের দর্পণে
সায়ক তোমার মিথ্যাই যাবে বেঁকে।

জানিয়ো কন্যা, আলেখ্য নাহি রয়
সরোবর বুকে নিত্য অনশ্বর,
দর্পণ পরে বহু ছায়া সঞ্চরে —
অভিমান নাহি সাজে দর্পণ 'পর।
বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে বাঁধিতে পারে ?
বিদ্যুৎ-গতি শাসনে বাঁধিবে কে সে ?
দৃষ্টি-মোহন নভোচারী উল্কারে
কে বাঁধিবে বুকে তপ্ত ভ্রমণ শেষে ?

দূরবর্তিনি, তোমার আমার মাঝে
উদাসীনতার স্ফটিক প্রাচীর গাঁথা,
দর্শন চাহি, স্পর্শন চাহি না যে,
পিপাসু নয়ন, ক্লান্ত চোখের পাতা।
ওগো গর্বিতা, সংহরো সংহরো,
এ নহেক মৃগ ত্রস্ত ও চঞ্চল,
অস্ত্র তোমার যত্নে রক্ষা করো,
শূন্য গগনে বাণ হানি' কিবা ফল!

জানুয়ারি ১৯৩৫

মা ফলেষু —

অনেক দিনের যত্নে রাখা আকাশকুসুমগুলি
তুব্‌রিবাজির ফুল্‌কি সম হঠাৎ মিলায় যবে,
সোনার ঝাঁপির ঢাক্‌না খুলে বেরোয় যখন ধূলি,
ভৈরবীসুর ডুবায় যখন গাড়ির চাকার রবে,
কাষ্ঠ-হাসি হাসে যখন আত্মীয়েরা সবে,
বান্ধবীরা নয়ন ফেরান মুখের দিকে চাহি,
যখন দেখি একলা আমি আছি বিশাল ভবে
তখন গীতায় স্মরণ করি 'ফলের দাবি নাহি'।

সমস্ত দিন ছোটাছুটি উমেদারির পর
এসে দেখি টাকার তাগিদ —নিয়েছিলাম কবে!
সে যদি যায়, এ মন্তব্য শুনি অনন্তর,
'ভালো করে চেষ্টাই নেই, কাজ কি করে হবে?'
ধার চাহিলে সদুপদেশ দেয় যবে বান্ধবে
'ছাড়ো এবার তোমার এ চাল-চলনটা বাদ্‌শাহী।'
আপন সত্তা মিলিয়ে দিয়ে তৃতীয় পাণ্ডবে
তখন গীতায় স্মরণ করি 'ফলের দাবি নাহি'।

পড়াশুনো বন্ধ যখন অনাহারের তাড়ায়,
দোষ ত্রুটিটা বিশ্বে যখন ছড়ায় সপল্লবে,
পুরো মাসের মাইনে যখন বাক্স থেকে হারায়,
রবিবারের ঘুমটি ভাঙে বিকট গানের রবে,
'সুদটা ফেলে দাও হে' বলেন কুসীদ্‌জীবী যবে,
তখন যদি বন্ধু শোনান চোখের জলে নাহি',
পত্নী তাঁহার স্পষ্টভাষায় কী বলেছেন কবে
তখন গীতায় স্মরণ করি 'ফলের দাবি নাহি'।

সংসারেতে ভাগ্য আসি' ব্যঙ্গ করে যবে,
হাস্য মুখে সহ্য ক'রে চল্‌ছি সগৌরবে,
অশ্রু যদি পড়তে চাহে চোখের দু'কোণ বাহি
তখন গীতায় স্মরণ করি 'ফলের দাবি নাহি'।

১৯৩১

আত্মীয়

একে তো আত্মীয়, তাতে টাকা আছে কয়েক হাজার,
একে তো মাকুন্দ মুখ, তার পরে পড়িয়াছে টাক!
যেদিন তোমারে দেখি বন্ধ হয় সেদিন বাজার;
জীবনে বৈরাগ্য আসে তোমা পাশে যদি পড়ে ডাক।
অমুক পোদ্দার তার টাকা আছে লাখ দশ বিশ —
তার সাথে দহরম-মহরম কেন দেখা যায়?
সে যদি পেন্সিল দেয় —অমনি 'বাঃ! কি সুন্দর! ইস্!'
সে যদি হঠাৎ হাঁচে —'অমুকদা এতোও হাসায়!'
এমনি অপূর্ব চীজ তুমি হলে আমার আত্মীয়
বিয়েতে দিতেই হবে একখানি নেমন্তন্ন-চিঠি।
সন্ধ্যার বাজার তাতে বেঁচে যাবে তোমার যদিও,
যদিও তা খেয়ে তুমি প্রচারিবে আমারি ত্রুটিটি।

২৬ জানুয়ারি ১৯৩৪

পুরুষস্য ভাগ্যম্

পুরুষের ভাগ্যলিপি জানিতে পারে না দেবতায়;—
তুমি সাহিত্যিক হবে সৃষ্টিকর্তা তা যদি জানিত,
তাহলে বস্তুত কিছু বস্তু দিত তোমার মাথায়,
তাহলে তোমাতে আর হরিজনে তফাৎ থাকিত।

আশ্চর্য! হলে না মুদি, হ'তে তুমি যাহার সর্দার,
(বাল্যকাল হ'তে তুমি ভালো করে করিতে যদি তা) ।
প্রাচীন লেখকদের আধুনিক হে হুঁকোবর্দার,
তুমিও বিখ্যাত হলে সেই দুঃখে লিখি না কবিতা ॥

৪ জানুয়ারি ১৯৩৪

পদ্য

বদ্যিনাথও পদ্য লেখে,
আপন চোখে আসচি দেখে।
চোদ্দখানা ডিক্‌সনারি
চলন্তিকা সঙ্গে তারি
সামনে থাকে, তার উপরে
দু'জন ডি-লিট্‌ মাইনে ক'রে
কাছেই আছে : কখন কী যে
আটকে যাবে, বদ্যি নিজে
তাই কি জানে? এই তো সেদিন
বদ্যি বলে, "মিল খুঁজে দিন
'নিস্‌নি' সনে"; অমনি তারা
কাগজ ঘেঁটে একশো তাড়া
বার ক'রে দেয় 'ধৃষ্ণি', তবে
বদ্যি মেলায় সগৌরবে ॥

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

জনগণ

জনগণ নামে এক পশু আছে মস্তিষ্ক-বিহীন,
জানে না সে আপনার শক্তি, তাই পৃষ্ঠে বহে ভার
কাষ্ঠ আর প্রস্তরের ; ক্ষুদ্র শিশু রশ্মি ধরি' তার
যে-পথে চালায়ে লয়, সেই পথে চলে সে অধীন।
একমাত্র পদাঘাত করে যদি, ভেঙে যাবে ক্ষীণ
শৃঙ্খল চরণ হ'তে, তবু ভয়ে শিশুর হুঙ্কার
মেনে চলে ; আপনি সে নাহি বোঝে ভীতি আপনার,
মিথ্যা বিভীষিকা দেখি' বিমূঢ় সে কাঁপে নিশিদিন।

অদ্ভুত ! সে আপনার হাতে বাঁধে পায়ের শৃঙ্খল,
রুদ্ধ করে আপনার মুখ ; আর যুদ্ধ ও মরণ
ডেকে আনে, তারি অর্থ রাজা যবে করে বিতরণ ;
তারি নিজ অধিকার স্বর্গ-মর্ত্য আর রসাতল
তাহা সে জানে না —যদি সেই কথা জানাতে কেবল
কেহ চায়, তবে তারে হত্যা করে পশু জনগণ ॥

১৯৩৮ ইটালীয় কবিতা থেকে

বোধন

কালো এক বিহঙ্গ ডানায় বয়ে আনে অমঙ্গল,
শাদা আকাশের রৌদ্র মুহূর্তেকে হয় অন্ধকার।
নিঃশ্বাস নিরুদ্ধপ্রায়, পুষ্ট দেহ অসাড় অচল,
এখন প্রলয় যদি আসে পরিত্রাণ নাই আর।
আতঙ্কে সুরঙ্গ-পথে ভীত বীর খোঁজে রসাতল,
মহামান্য মহাজন প্রাণভয়ে করে হাহাকার,
পাপের নিয়তি আসে, অব্যর্থ সে গৃধিনী-কবল,
জীবন্তের শব-ভুক্, কৃষ্ণ অভিশাপ বিধাতার।

মাহেন্দ্র-মুহূর্ত এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর স্তুতির।
হে তান্ত্রিক, সুরু করো তোমার নিষ্ঠুর বামাচার
না হতে রক্তের স্রোতে খোঁজা শুরু স্বর্ণ শস্যকণা।
আবার সংগ্রাম হবে স্বর্ণ লঙ্কা আর জীর্ণ চীর,
পুনরায় আকাশেরে বিঁধে দেবে লক্ষ হাতিয়ার
ভীষ্মের মতন, যদি ব্যর্থ হয় তোমার সাধনা॥

১৯৩৯

ভঙ্গুর প্রবাল

দম্ভের গলিত ব্রণ যত পচা, স্ফীতকায় যত,
স্পর্শে তার তত বিষ, পূতিগন্ধে তত মহামারি,
অন্যায়ের বিস্ফোটক দেশে দেশে জাগে সারি সারি,
ভয়ঙ্কর বীভৎস সে, কিন্তু সুগভীর তার ক্ষত।
উন্মত্ত কুত্তার পিছে ধ্বংস আসে চাবুকের মতো,
সময়ের চোরাবালি তত টানে স্পর্দ্ধা যত ভারি,
সূর্যেরে যে ছুঁতে যায় পুড়ে মরা ভাগ্যলিপি তারি–
পাপ মহাপরাক্রম, কিন্তু তবু আয়ু তার কত?

হিংসার শোণিত সে কি মুছে নেবে সব শ্যামলতা?
মানুষের ধমনীতে কলঙ্ক কি রবে চিরকাল?
যদিও আজের মতো শুক্লা সন্ধ্যা নিষ্ফলা অযথা,
তবু জানি মৃত্যুহীন চাঁদের অতনু ইন্দ্রজাল।
স্পর্দ্ধারে অবজ্ঞা ক'রে কানে কানে হৃদয়ের কথা
উদ্যত অস্ত্রের নিচে জীবনের ভঙ্গুর প্রবাল॥

বৈশাখ ১৩৫০

পতঙ্গ

পতঙ্গের মরণের ডাক এলো
বৈশ্বানর, লেলিহান্ শিখা তোলো।

আকাশের জ্যোতির্লোকে ভ্রান্তি-বহ্নি—
যৌবনের ক্ষমাহীন মৃত্যুলোক,
ত্রিকালের পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প
আমাদের আয়ু নিয়ে তৃপ্ত হোক।

হিংসাতপ্ত পৃথিবীতে মুহূর্তেক
তবু যদি পক্ষ মেলে পতঙ্গের,
পেয়ে থাকি দিগন্তের স্পর্শ-স্বাদ
জীবনের সে-সঞ্চয় অনন্তের।

যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির লগ্ন এই,
চরিতার্থ এ-যৌবন বলি তার,
আকাঙ্ক্ষার প্রণয়ের মহত্ত্বের
তিলোত্তম, বলি আজ কবিতার।

তবু এই যজ্ঞফল সত্য হোক্
তৃপ্ত হোক রক্তলোভী স্বর্গলোক,
পতঙ্গের মরণের ডাক এলো,—
বৈশ্বানর মৃত্যু এই ধন্য হোক॥

১৯৪৪

বে-আব্রু

সেলাম করি সরকার!
মনের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
চোখের আব্রু দরকার।

কতই কিছু স্বপ্ন ছিল
মনের মধ্যে বন্দী,
নতুন জীবন নতুন জগৎ
গড়ার অভিসন্ধি —
হুজুর, তুমি চোখ ফোটালে,
হাজার যুগের পুণ্য !
সকল জমা আজকে খারিজ
মনের খাতা শূন্য ।

সেলাম করি সরকার !
মনের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
দেহের আব্রু দরকার ।

ফিরিয়ে দিলে মহাপ্রভু
প্রাচ্য দেশের শিক্ষা,
স্বর্গে যাবার পথের মোড়ে
শ্রেষ্ঠ সহায় ভিক্ষা ।
ছাড়তে তবু মিথ্যে মায়া
মিথ্যে পাপীর কান্না,
সভ্যতা কয়, পাওয়ার আগেই
চাই চ্যাচানো 'আর না' ।

সেলাম করি সরকার !
চোখের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
মনের আব্রু দরকার ।

ছোট্ট চোখে অমূল্য এই
একটুখানি দৃষ্টি,
এই দু'চোখে আর ধরে না
তোমার মহাসৃষ্টি !
সভ্যতার এ কীর্তি তুলুক
শূন্যে জয়ধ্বজা,
আমার দেখা ফুরোক, এবার
তোমরা দেখো মজা।

সেলাম করি সবকার !
দেহের আব্রু ঘোচালে, আজ
চোখের আব্রু দরকার ॥

১৯৪৩

শাস্তি

ভুখ-মিছিলে চোখের আলোর কোনোই মূল্য নাস্তি -
এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি।

কোন্ প্রভাতের পাখির গানে কবে,
হারিয়ে যাবে আজকে দিনের আর্ত হাহাকার —
শরৎ আবার মেলবে ডানা ফুল-মেঘে ধব্‌ধবে,
আমার হৃদয় ফিরবে না তো আর !

আকাশ-ছেঁড়া সোনার তারার অক্ষয় বৈভবে
মনের আসন সাজিয়েছিলাম কবে।
তোমার ক্ষণিক-আবির্ভাবে ধন্য সে বেদীতে
রক্ত-লোলুপ যুগের দেবী এলেন প্রাপ্য নিতে।
তোমার পায়ে দেবার মতো যৎসামান্য পুঁজি
সকল তাকেই খাজনা দিয়ে নতুন ভিটে খুঁজি।

শস্ত্রপাণির বজ্রঘোষে স্বপ্ন নাহি বাঁচে,
নগদ লাভের হট্টরোলে স্মৃতির কী দাম আছে?
তোমায় যদি বসাই এনে মনের সিংহাসনে
সর্বজনের মুক্তি হবে হয় না তা তো মনে;
কালের যন্ত্র তাই বা কোথায় হলাম সত্যিকার?
চিন্তা-মুরুব্বিরা করেন যথার্থ ধিক্কার।
তবুও যে মনের পর্দা হঠাৎ ছিঁড়ে যায়,
চূর্ণ কেশের স্পর্শ আসে দক্ষিণা হাওয়ায় —
যুগান্তরের সন্ধিতে তার কোনোই মূল্য নাস্তি,
অবুঝ মনে এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি ॥

২৭ মার্চ ১৯৪৪

জয়ের আগে

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পায়ের নিচে
কত অরণ্য-গিরি-জনপদ গুঁড়ায়ে গেছে,
নিঃসাড় এই প্রেত-পল্লীরও দগ্ধ মাঠে
ফেলিলে চরণ! মহাশ্চর্য কী আর আছে!
প্রণমি তোমারে, দিগ্বিজয়ের রাজ্যভাগ
তোমারি থাকুক, আমরা কেবল ভিক্ষা চাই —
যুদ্ধের পথ এঁকেছ যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই।

সাত সমুদ্র তেরো নদী নখ-মুকুরে বটে,
কূপের বার্তা তত জানাশোনা হয়তো নেই,
পক্ষীরাজের চর্যা যাহার আশৈশব
ভেক-পরিচয় নহেক তাহার আয়ত্তেই।

কাহিনী তোমার ইতিবৃত্তে রক্ষণীয়,
মিনতি মোদের, ভট্টজনেরে ভিক্ষা দিয়ো ;
আমাদের শুধু দিয়ো কিঞ্চিৎ চরণ-ছায়া
এবং তোমার দর্শন অতি দর্শনীয়।

রাজার কাহিনী বহু-বিশ্রুত, প্রজার কথা
রাজভট্টের মহাকাব্যেতে ক্বচিৎ-ই মেলে,
রাজ্যশাসনও শুনি লোকমুখে দুরূহ নয়
রাজপুরুষেরা রাজস্বর্ণের অংশ পেলে।
তাই অনুরোধ, রাজকন্যার সোহাগ ফাঁকে
অতি অভাজন প্রজাগণ প্রতি করুণা করি'
দিয়ো একবার দর্শন —বহু বিজ্ঞাপিত,
ক্রূর বুভুক্ষা ভুলি যাতে সেই গর্ব স্মরি'।

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পুচ্ছ ঘেরা
মরকত আর বৈদুর্যের মালার প্রতি
করিব না লোভ, শপথ তোমার, ঈর্ষাবশে
ভাগ্যে তোমাব করিব না রোষ, দণ্ডপতি !
বহুপ্রতীক্ষমানা-বাঞ্ছিত হে বীববর,
অতি দরিদ্র অভাজন মোবা ভিক্ষা চাই,
যুদ্ধের পথ এঁকেছ যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই ॥

১৯৪৪

নষ্টচাঁদ

এ-আষাঢ়ে শেষ হোক কান্নার বন্যা
ও-আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত,
ক'বছর মন দিয়ে করো ঘরকন্না
বুড়োকালে প্রেম হবে অদ্ভুত।

মুখোমুখি বসে শুধু সকালে ও সন্ধ্যায়
দম্পতি-সুখ বলো হয় কার ?
সংসার-ধর্মেতে যে মেয়েরা মন ছায়
পৃথিবীতে তাদেরি তো জয়কার।

মেয়ে মানুষের বেশি মন থাকা উচিত না,
আমাদের মন তাই পারিনেকো সাম্‌লে।
রুদ্র-গ্রীষ্মে আকাশে থাকেই তো তৃষ্ণা
সব মিটে যাবে চোখের বর্ষা নাম্‌লে।
দুটো পয়সার সাশ্রয় কিসে হবে
সেদিকে বরং পারো যদি চোখ রাখ্‌তে,
বুড়ো হয়ে যদি বেঁচে ও বর্তে রবে
পাকা-বাড়ি করে' সেখানে পারবে থাকতে।
শখ্‌-টখ্‌ যত সবই জেনো ছেলেমান্‌ষি
কুড়ির পরে কি ও-সব রাখ্‌তে আছে ?
জীবন তো নয় সুখের জোয়ারে পান্‌সি,
আসল প্রশ্ন প্রাণটা কী ভাবে বাঁচে।

হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
আগ্নেয়গিরি মেঘের চূড়ায় গলিত চাঁদের ধারা।
পাশ ফিরে শুই ; চাঁদের ভেল্কি সবই জানা গেছে মেকি,
মিথ্যে শরৎ, নেহাৎই মিথ্যে আকাশ-ছড়ানো তারা।
তুমি পাশে থাকো রূপোর কাঠিতে মূর্ছিতা চিরদিন —
গৃহিণী-সচিব-শিষ্যা এবং —এবং কি জানি কী যে,
জানি না, জান্‌তে চাইনে, জান্‌লে রোজগার হবে ক্ষীণ,
চাঁদ তো উপোসে মরে না, কিন্তু বেঁচে থাকা চাই নিজে॥

১৯৩৮

প্রথম গ্রীষ্ম

গ্রীষ্মের উত্তাপ আসে শীতের আবদ্ধ দরোজায় ;
মৃদু তার করাঘাত, যেন রজনীর শেষ ক্ষণে
কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ লঘু ক্ষীণ ভীত আবাহনে
ডেকে যায়, ডেকে যায়, তারপর হঠাৎ হারায় !
এইতো জাগার ক্ষণ, এরপর তপ্ত আলিসায়
কাকের কর্কশ-কণ্ঠ, এরপর অবসন্ন মনে
অগ্নির অঙ্গুলি স্পর্শ, মধ্যাহ্নের কঠোর শাসনে
সহস্রের সমুদ্রের মাঝে যাবে হৃদয় হারায়ে।

যৌবনের ভালোবাসা কতোদিন মৃত্যুহিম যেন—
অবসন্ন, এলায়িত, খেলাক্লান্ত শিশুর মতন।
গ্রীষ্মেব প্রথম তাপ ! এনেছ কি উদ্বেল সফেন
বিশল্যকরণী সুবা, স্বাদে যার জাগে অচেতন ?
পার্বতীর তপোতাপে গলেনি কি মহেশের ধ্যানও ?
হৃদয় ! ঘুমন্ত আর কতদিন ? আর কতক্ষণ ?

৭ অক্টোবর ১৯৩৮

পলাতক

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ জ্বালিয়ে —
গেল পালিয়ে।

গেল চাঁদ, গেল কোথা, কদ্দূর ?
পেরিয়ে সমুদ্দুর,
পেরিয়ে আকাশ ভরা তারা —
পার হয়ে গেল চাঁদ চোখের পাহারা।
মনের খুকুকে চুপে ঘুম পাড়িয়ে
গেল চাঁদ দেশ ছাড়িয়ে।

কপালে চুমোর টিপে লিখন এঁকে
গেল চাঁদ কোথা জানে কে ?
গেল কি সে পশ্চিমে তুষার দেশে ?
গেল সে ভেসে ?
সেই শাদা দেশে বুঝি শাদা কপালে —
চাঁদা মামা টিপ্ লাগালে ?
গেল চাঁদ, গেল পালিয়ে
আঁধার-কপালে টিপ্ দীপ জ্বালিয়ে।
গেল কি সে আমাদের আকাশ হ'তে
কালো এক ঝড়ের স্রোতে ?
রাত আরো কতই বাকি ?
মনের খুকুর ঘুম ভাঙ্‌বে না কি ?
কালো রাত কাট্‌বে না কি ?

চাঁদের কপালে কেন টিপ্ জ্বালিয়ে,
চাঁদ চুপে গেল পালিয়ে ?
ক্লান্ত অবশ চোখ জাগে পাহারা
তন্দ্রাহারা,
ছন্দহারা
চোখের তারা।

আঁধার কপালে কেন টিপ্ জ্বালিয়ে
দুষ্টু চতুর চাঁদ গেল পালিয়ে ?

৩০ এপ্রিল ১৯৪৪

কোন্ পথে

শালের বনের ফাঁকে শাদা সরু পথ কোথা গেছে?
কোন্ পথে উড়ে' চলে বুনো হাঁস? —সকল পথের
হয়েছে কিনারা, একদিন অরণ্যের নিচে নিচে
আমিও এসেছি দেখে চক্রবালে অবসান এর।

ও-পথে ওদের পিছে হৃদয়েরে দেখেছি পাঠায়ে
পৃথিবীর দশ দিকে —ক্ষেতে, মাঠে সমুদ্রে, পাহাড়ে,
সব পথ, ধাঁধা যেন, ঘুরে ফিরে যায় শেষ হয়ে
চেনা এক গম্বুজের পাশে, চেনা সড়কের ধারে।

বুনো হাঁস সেই পথে উড়ে' যায় ধোঁয়ার নেশায়
রোস্ট্ কি কাবাব হয়ে বিহঙ্গ জন্মেরে ধন্য করে;
সেই পথে দেহাতের মেয়েদল চলে কারখানায়
পায়েচলা পথ ছেড়ে লোহা বাঁধা সম্ভ্রান্ত শহরে।
বনের আলের পথে, চাষার মেয়ের পিছে পিছে
আমার হৃদয় গিয়ে থামে শেষে চৌরঙ্গির পিচে॥

১৯৪৫

সৈনিক, মৈনাক হও

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে

সৈনিক, টিউনিক কোথা? যুদ্ধোদ্যত কোথা বেয়োনেট্?
অধুনা শরণাপন্ন অন্তঃপুরে অঞ্চলের নিচে?
রাইফেল কি ফেল বন্ধু? কোথা ধার উগ্র সে কিরিচে?
বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ? আমাদেরো মাথা হেঁট।

মৈনাক যে ছিলো স্তব্ধ, জরদ্গব, পাথরে নিরেট,
তারে যে হেনেছ কশা তীক্ষ্ণবাক্যে, সে কি সব মিছে?
স্পষ্ট সত্য বলি শোনো, শৃঙ্খলার গুরুতর ব্রিচ্-এ
অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ সংগ্রামের নহে এটিকেট্!

যখন আছিল শুধু দীর্ঘদিন, নিস্পন্দ প্রহর,
অরণ্য যখন ছিল স্বপ্নে মগ্ন, অন্ধ অচেতন —
মৈনাকেরে সেইদিন চেয়েছিলে বানাতে সৈনিক।
আজ পরিহাসলোভী পঞ্চশর প্রতিশোধ নিক্;
অরণ্য জাগ্রত আজ, শোনো তার মদির গুঞ্জন,
সৈনিক, মৈনাকবৎ এইবার বন্ধ করো ঘর।

১৯৪০

নইলে

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে,
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস্ করেছ কি দৌড়ে?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া ক'রে বাড়ি থেকে বাড়িয়োনা পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

১৯৪৩

শীলাভট্টারিকা

রেবাতটে, বেতসের কুঞ্জছায়া শীতল যেথায়,
সভয়ে সলজ্জপদে পৃথিবীর আঁখি এড়াইয়া
আসন্ন আসঙ্গ-আশা-আশঙ্কায় দুরুদুরু হিয়া
আসিল কুমারী কন্যা পরীর মতন লঘু পায়।
যেথায় কৌমারহর মৃদু পদধ্বনি প্রতীক্ষায়
জাগিতেছে উৎকণ্ঠিত রজনীর প্রহর গণিয়া
সেথা সে থামিল আসি, তারপর রজনী মথিয়া
অপূর্ব দেহের সুধা আস্বাদিল বসন্ত ক্ষপায়।

সে-মুহূর্তে রেবাতটে·বেতসের শান্ত কুঞ্জতটে
পুঞ্জিত আনন্দ আসি থেমে গেল স্তম্ভিত চরণ,
বেতসের কুঞ্জ হ'তে ফিরে যায় ছায়া ছুটি কার !
আবার চৈত্রের জ্যোৎস্না নামে দম্পতির শয্যাপটে
বাতাসে খুলিয়া যায় শিয়রের রুদ্ধ বাতায়ন,—
মনের সমুদ্র শুধু স্পন্দহীন শীতল তুষার ॥

২১ এপ্রিল ১৯৩৩

সাঁওতালি মেয়েরা

সাঁওতালি মেয়েরা বনের পথে
নেচে নেচে চলে যেন হরিণ-ছানা,
সাঁওতালি মেয়েরা কোন্ জগতে
ভেসে চলে যেতে চায় নেই ঠিকানা।
চুলে তারা গোঁজে ফুল, হাসে খিল্‌খিল্‌,
শুক্‌নো পাতার পথে চলে খুশিতে,
মহুয়া বনের সাথে কী ওদের মিল !
বনের পরীরা যেন ওদের মিতে।

সাঁওতালি মেয়েরা বনের হাওয়ায়
উড়ে উড়ে চলে যেন বনের পাখি,
রোদ্দুরে, কখনো বা শালের ছায়ায়,
কখনো বলাকা যেন, কভু একাকী।
কখনো আমার মনে করে তারা ভিড়,
আবার কখনো আসে পা টিপে একা,
সাঁওতালি মেয়েরা কী যে অস্থির !
মনের খাতায় তাই যায় না লেখা ॥

১৯৪১

ইতিহাস

গহীন নিশ্ছিদ্র অরণ্যেরো পরপারে আছে পথ,
আছে পর্ণকুটীরের চুম্বন-সম্বল ভালোবাসা,
দুর্বল মুহূর্ত শেষে তাই মনে বলিষ্ঠ দুরাশা,
কামচারী দুর্নিবার তাই আজও কল্পনার রথ।
একদা যে স্বেচ্ছাঋণে বদ্ধ হয়ে করেছি শপথ
লিখে যাবো হৃদয়ের ইতিহাস— তৃপ্তি ও পিপাসা,
আশা জাগে হয়তো বা সে দুর্লভ দুষ্প্রকাশ ভাষা
কোনোদিন লেখনীতে ধরা দেবে প্রেমাস্পদাবৎ।

হৃদয়ের ইতিবৃত্ত! বোধাতীত, পরিবর্তমান!
যার হাতে হাত দিয়ে লঙ্ঘেছি দুর্গম, দীর্ঘ আয়ু
আমার সত্তার মাঝে সে তো আজ ওতপ্রোত মাখা,
সহস্রের আত্মা আজ আমাকে যে শোনায় আহ্বান,
প্রাণ তাই বলোড্ডীন, সদ্যোজাত যেন সে জটায়ু,
চলেছি সম্মুখে শুধু এইমাত্র ইতিবৃত্তে বাখা॥

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

কাঠ

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ —
স্তম্ভিত অরণ্য স্তব্ধ!

অশ্বত্থ শাল্মলী ন্যগ্রোধ মহীয়ান্
লুণ্ঠিত গর্বিত-শির,
স্বর্গস্পর্শী প্রায় শক্তির অভিমান
হৃত আজ বনস্পতির।

শতাব্দী-চেষ্টায় কৃষ্ণপক্ষ 'পর
দ্বিতীয় পৃথ্বী গড়ি' মর্ত্যে
মানব-অবজ্ঞাত বিচিত্র সুন্দর
শ্বাপদ যে পালে পরিবর্তে,
বন-শরশয্যায় সেই বন-ভীষ্মের
অপূর্ব এ আত্মদান,
স্বার্থপরের হীন সংগ্রামে বিশ্বের
মহত্ত্ব লুণ্ঠিত-মান।
ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ —
বিস্মিত অরণ্য স্তব্ধ !

অন্যায় যুদ্ধের অন্তিম হত্যা কি
মহতের গর্বিত আত্মার ?
মুক্তির রাজ্য কি বিন্দু রবে না বাকি
হিংসার পথে জয়যাত্রার ?
আম্র-তমাল-ছায়া প্রসুপ্ত বনচর
ব্যাঘ্র-বরাহ গজরাজ,
পশুপতি সিংহ ও ভল্লুক অজগর
পরাস্ত হিংসায় আজ।

লাঞ্ছিত স্বাধীনতা, ভগ্ন শূন্য নীড়,
সৌন্দর্যের অবসান,
স্রষ্টা আত্মদাতা মহীরুহ দধীচির
লৌহ-দানব হরে মান।

ঠক্ ঠক্ কুঠারের শব্দ —
শঙ্কিত অরণ্য স্তব্ধ ॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

আশা

একদিন মনে হয়েছিল বুঝি নীলে ও শ্যামলে
আমার সত্তারে গ্রাসি' মনের ঘটাবে পরাজয়,
বুঝি পথপ্রান্তে শুয়ে ক্লান্ত আত্মা স্বপ্নের আশ্রয়
বেছে নেবে চিরতরে চন্দ্রমার জাদুর কৌশলে।
প্রেমের মর্যাদা বুঝি দুর্বল মনের অন্তস্তলে
সুদূর পূজায় মাত্র কোনোদিন হবে অপচয়,
মনে হয়েছিল বুঝি মহাকাল-অধীন হৃদয়,
আত্মা বুঝি বয়সের ন্যুব্জতারে অনুকারি' চলে!

সবি ভুল! আজো আমি সুস্থ-আত্মা বলিষ্ঠ চরণ,
এখনো নামেনি মাথা মেরুদণ্ড বেঁকেনি এখনো
মনের মঞ্জুষা আজো দস্যু হ'তে রেখেছি বাঁচায়ে,
শিখেছি পথের বার্তা রৌদ্রে ঝড়ে কভু আম্রছায়ে,
সূর্য যেন কাছে আজ, চিনি যেন শর্বরীর মনও,
সম্মুখে উত্তুঙ্গ আশা, জানি হবে সম্পূর্ণ পূরণ॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

বিশ্রাম

সহস্র সহস্র জন্ম চলে গেল। শতাব্দীর পর
এলো মহা-মন্বন্তর, সে তো আজ হল কত কাল!
কুরুক্ষেত্র, পাণিপথ, পলাশীর রক্তের অক্ষর
জলের লেখার মতো মুছে গেল। স্মৃতির জঞ্জাল
দূর হোক্ চিত্ত হ'তে, অতীতের মিথ্যা ইন্দ্রজাল
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে এসো, এইখানে বাঁধি পুনঃ ঘর।
এ-মুহূর্তে ভু'লে যাও তুমি আর আমি জাতিস্মর –
চেয়ে ছাখো, সূর্য আনে নবজন্মে নতুন সকাল।

ঊনবিংশ অক্ষৌহিণী শবদেহ অতিক্রম করি'
রক্তাক্ত চরণ, এসো, মেলে দিই হিমসিক্ত ঘাসে,
লক্ষ বর্ষ পরে যেন, এসো করি কুসুম চয়ন।
আবার নয়নে ঊষা, জ্যোতিকেশা কন্যা বিভাবরী,
পরিস্নাত হয়ে এসো, অনন্ত পথের এক পাশে
অফুরন্ত জীবনের একখণ্ড করি আহরণ॥

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

উত্তরণ

ভেজা ঘাসে পা ফেলে কেবলি
মেঠো পথে বনপথে চলি।

অধমর্ণ বালির প্রতাপ
ঋণলব্ধ শক্তির নেশায়
যে-পথে হেনেছে অভিশাপ
সে-পথ পশ্চাতে লুপ্তপ্রায়।
গ্রীষ্মস্পর্শ জাগরূক মনে
সৌরভের নতুন আহ্বান,
বিষাক্ত নির্মোক-মুক্ত মনে
আবার প্রাণের জয়গান।

দ্যাখো দ্যাখো ঐ শৈলচূড়ায়
নতুন বরফ গলে,
আস্‌বে সে-স্রোত এই মাঠটায়
উষর এ-অঞ্চলে।
স্নানে পানে আর ফসলে আবার
তৃপ্তির সুস্বাদ,
তীরে তীরে ফের ঘর গড়বার
উদ্বেল সংবাদ।

অন্যায়ের বর্মে ঢাকা স্বার্থটুকু সযত্নে বাঁচাতে
হাস্যকর প্রচেষ্টার পিছে পিছে ছায়াসঙ্গী প্রায়
আসে কাল ; বর্মচ্ছেদী সুতীক্ষ্ণ পরশু এক হাতে,
অন্য হাতে স্বর্ণাক্ষর-ইতিবৃত্তে মুক্তির উপায়।
সে-স্বর্গের সিঁড়ি গড়ি' কল্পান্তের ধ্বংসের কঙ্কালে
উদ্বৃত্ত মানব চলে তথাপি অক্লান্ত অনমিত।
মানুষ মরে না, শুধু কভু রক্তশিখা জ্বলে ভালে,
কখনো চন্দনে স্নিগ্ধ জয়টিকা ললাটে মণ্ডিত॥

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

না-না-না

দস্যি ছেলের দত্যিপনা, আব্দারেদের কান্না —
আর না!
চুপটি করে' একটু যদি ভাবছি লিখি কাব্য,
হুল্লোড়ে আর চিৎকারে কী সাধ্যি লেখায় নাব্‌বো!
মগজ যেন ভীমরুলি চাক, চক্ষে দেখি শর্সে,
গুণ্ডাগুলোর শয়তানিতে মুণ্ডু ঘোরে জোরসে।
শান্ত মনের দিঘির জলে ঢিল ছুঁড়ে দেয় হরদম,
মনের খাতার লেখার পাতায় ছিটোয় কালো কর্দম।

বিদ্যেবোঝাই ডিগ্রিবীরের নামের লেজুড় গয়না —
সয় না!
বাক্যবীরের তীক্ষ্ণভীষণ মর্মভেদী তর্কে
প্রাণ কেঁপে যায়, বুদ্ধি ঘোলায়, কাব্য পালায় ভড়্‌কে।
লম্বা কথায় জট্ বাঁধে আর চওড়া কথায় সিন্ধু,
খুশির আকাশ ধোঁয়ায় ঢাকে, রয় না আলোর বিন্দু।
গ্রন্থকীটে ডিম পেড়ে যায় লক্ষ পুনরুক্তির,
মনের ফোটা ফুলবাগানে লাঙল চালায় যুক্তির।

বুক্‌নি-চটুল চাকরি-সুখীর হাজার টাকা মাইনে —
চাইনে !
দশটা-পাঁচের বন্ধ ডোবায় চোখ-রাঙানির পঙ্কে
বছর বছর শ্যাওলা বাড়ে লক্ষকোটির অঙ্কে,
পানায় ঢাকে জোচ্ছনা-রোদ, মন খাবি খায় বন্দী,
পয়সা গুনে' কাট্‌লে সময় ছন্দে কখন মন দি ?
মনের পাখির হাল্কা ডানা চালবাজি আর দম্ভে
যতোই ভারি হয় ক্রমশ ততোই ওড়া কম্‌বে ॥

৪ ডিসেম্বর ১৯৪৫

পশ্চাতের আমি

পথের প্রারম্ভ যেথা চক্রবালে অস্পষ্ট রেখায়
পুরোনো পত্রের মতো বিস্মৃতির ধুলায় ধূসর,
মনে হয় চিন্তার সে পরিত্যক্ত দূর দেশান্তর
আজো যেন পিছুটানে আমারে ফিরায়ে নিতে চায় ;
তন্দ্রার অলিন্দ হ'তে চেতনারে ডাকে ইসারায়,
দুস্তর যাত্রার পথে ইন্দ্রজালে রচিয়া বাসর
কৈশোরের ভ্রান্তিমূল্যে আমারে লভিতে চায় বর,
পশ্চাতে যা জীবন্মৃত, সম্মুখে সে আসে প্রেতপ্রায়।

একদিন এ-জীবনে সত্য ছিল তুচ্ছের বেসাতি —
স্মৃতির ঐশ্বর্য —তবু বাধা আজ স্বচ্ছন্দ গতির,
নিঃশঙ্ক গৌরবে তাই ছিন্ন করি পূর্ব অঙ্গীকার।
প্রাণের স্রোতের সাথে গতি যার সেই শুধু সাথী,
তুচ্ছ তাই দুঃখ শোক অতীতের সমস্ত ক্ষতির,
সমুদ্র ডেকেছে যারে সম্মুখই শাশ্বত মাত্র তার ॥

৩ জানুয়ারী ১৯৪৬

নবজাতক

কালস্রোতে ভেসে গেল জীবনের পুঞ্জিত জঞ্জাল —
স্নেহার্দ্র স্মৃতির তটে লগ্ন ছিল যত মিথ্যা প্রীতি,
সখ্যতার ভাণ আর তারুণ্যের মোহান্ধ স্বীকৃতি
প্রাণের বন্যায় ধুয়ে সবই মুছে নিল মহাকাল।
জীবনের দ্রুতগতি রুদ্ধ ক'রে ছিল যে শৈবাল
যদি লুপ্ত হয়ে থাকে, জানি এ-ই জীবনের রীতি,
সঞ্চয়ে যা গুরুভার, ত্যাগে নিত্য লঘু ক'রে জিতি, —
প্রাণের আবেগ তাই বাধামুক্ত, শক্তিতে উত্তাল।

অপূর্ব গতির হর্ষ, জন্ম হতে ফিরি জন্মান্তরে
গ্রহ হতে অন্য গ্রহে মেলে দিয়ে দৃষ্টির প্রসার,
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে জাগে অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বাদ।
পথে পথে অভিজ্ঞান রেখে চলি ত্যাগের স্বাক্ষরে,
বর্জনের উপার্জনে পূর্ণ করি পাথেয় যাত্রার,
বারংবার মৃত্যুরূপে আসে জীবনের আশীর্বাদ ॥

৪ জানুয়ারি ১৯৪৬

যাত্রা

আশার কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরের দূর যাত্রী আমি,
দুস্তর প্রস্তর-পথে দুঃসাহসে চলেছি সম্মুখে।
সুলভ ফেনিল মদ্যে এখানে জমে না নেশা বুকে,
খ্যাতির মুদ্রার জানি এ যাত্রায় নেই কোনো দাম-ই,
এ পথে বিদ্রূপরূপে তুষারের স্রোত আসে নামি'
নিবাতে আত্মার তাপ,—নন্দীভৃঙ্গী হাসে সকৌতুকে,
এ যাত্রায় নিদ্রা নেই, তৃপ্তি নেই তুচ্ছতার সুখে,
চতুর বাণিজ্য নেই বঞ্চনার —মহত্ত্বে বেনামি।

অভিযাত্রী সঙ্গী চাই!   চিত্ত কার প্রশস্ত নির্ভীক?
অষ্টপণ মূল্যে কেনা মাল্য কারে করে না দুর্বল?
কে আছো সন্ধানী জিষ্ণু?—এসো সাথে, ধরো এসে হাত।
উত্তুঙ্গ সৃষ্টির লক্ষ্য আমাদের ঊর্ধ্বে টেনে নিক,
দুর্বলের লভ্য নয় দেবতাত্মা কীর্তি-হিমাচল,
পিচ্ছিল অন্তর যার এ-যাত্রায় তারি অপঘাত॥

১৫ জানুয়ারি ১৯৪৬

পুনরাগমনী

বিচ্যুত স্বপ্নের ফুল, স্রোতে যত গিয়েছিল ভেসে
আবর্তে হারায়ে পথ আবার এ-ঘাটে লাগে এসে,
কিমাশ্চর্যমতঃপর!   তারুণ্যের দুর্দম্য কামনা
ছিল যত ইতস্তত, আজ দেখি ফসলের সোনা
বিক্ষিপ্ত সে বীজ হতে আপনারে করেছে বিস্তার,
উচ্ছৃঙ্খল মন করে জীবনের বশ্যতা স্বীকার
সানন্দে স্বেচ্ছায়।   একদিন মনে হয়েছিল বুঝি
নোঙর ছিঁড়েছে নৌকা, অপব্যয়ী যৌবনের পুঁজি
বন্দরের অন্ধকারে পশ্চাতে হয়েছে অপচয়,
হারানো সম্পদ ফিরে কখনো পাবার বুঝি নয়।
আজ দেখি প্রৌঢ়ত্বের গৃহপ্রবেশের শুভক্ষণে,
আবার এসেছে ফিরে যে ঐশ্বর্য ছিলো বিস্মরণে,
অবচেতনায়।   তাই অসঙ্কোচে অতিথির ঠাঁই
মনের প্রশস্ত কক্ষে অনায়াসে তৃপ্তিতে জোগাই।

যদিও নতুনরূপে তবু জানি ছদ্মবেশ ফেলে
বিস্মৃত মাধুর্য নিয়ে যৌবনই আবার ফিরে এলে॥

১৯ জানুয়ারি ১৯৪৬

বুড়ির ঝুড়ি

মাথায় নিয়ে বাজে কথার ঝুড়ি
রাস্তা চলে আন্তিকালের বুড়ি।

সত্যি-যুগের মিথ্যে-যুগের হাল্কা ভারি মিষ্টি,
লম্বা ছোট গল্প যত সব আছে তার লিস্টি।
মনের পথে রাত-বিরেতে সময়-অসময়ে
কাজের ফাঁকে ঘুমের ঘোরে গল্প বেড়ায় বয়ে।
রাশভারি কি হাল্কা মেজাজ, চটুল কিম্বা বাজে,
সবাই শোনে বুড়ির আওয়াজ হঠাৎ মাঝে মাঝে।

সব রকমের গল্পে বুড়ি ভর্তি রাখে ঝুড়ি
যখন তখন গল্প বিলোয় দু'দশ হাজার কুড়ি।
ছোট্ট ছেলের পছন্দসই মিষ্টি-মাখা গল্প,
পণ্ডিতেরও মনেব মতো হরেক পুরাকল্প,
একটু বড়োর স্বপ্ন-মাফিক গল্প অসম্ভাব্য,
তরুণ জনের ফরমাশি সে গল্প তো নয় কাব্য,
চিন্তাশীলের গল্প আছে তত্ত্ব কথায় পূরতি,
হাল্কা-কথার খরিদ্দারের গল্পে গাঁথা ফুর্তি,
যার যেমনই পছন্দ আর যাব যতটা চাই
আন্তিকালের বুড়ির কাছে মিলবে হামেশাই।

বিলোয় বুড়ি গল্প-গাথা গঙ্গা থেকে কঙ্গো,
হাজার ছাঁদের গল্প রে তার, লক্ষ তাদের রঙ্গ।
কেউ বা শুধু কুড়িয়ে রাখে মনের ঝাঁপি ভর্তি,
কেউ কাগজে কালোর দাগে কুড়োয় ঝড়্তি পড়্তি,
কেউ বা করে গল্প-বিলাস, গল্প লেখে অন্যে,
বুড়ির ঝুড়ি ভর্তি তবু ভবিষ্যতের জন্যে॥

জানুয়ারি ১৯৪৬

গণ্ডি

মানুষের আশা-স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার হত্যাযজ্ঞ শেষে
রক্ত-কলঙ্কিত হাতে রাজদণ্ডে জন্মে অধিকার,
অশ্বমেধ-নরমেধ রাজপুণ্যে তুল্য অংশীদার,
কঙ্কালের সিংহাসনে রাজত্বের ভিত্তি দেশে দেশে।
চেঙ্গিজ-তৈমুর আত্মা চিরন্তন বেতালের বেশে
প্রেতমন্ত্রে বেঁচে হয় বিক্রমের স্কন্ধে গুরুভার ;
গৌরব সমুচ্চ তত, যত সাঙ্ঘাতিক হাতিয়ার,
লক্ষগুণ শাস্তি তার, যেটুকু সান্ত্বনা ভালোবেসে।

সংসার-সম্রাট্ তাই রাজস্বের নামে মেলে হাত,
শাসনে পেষণে দায়ে, আত্মার সর্বস্ব চায় কর,
জীবনের উনশত অংশ দিই শতাংশ বাঁচাতে,—
সেই ক্ষুদ্র অবকাশ-বাতায়নে শর্বরীর সাথে
অভিসারে আসে প্রেম পূর্ণ ক'রে ক্ষুদ্র অবসর,
সংসারের দিগ্বিজয়ী রথচক্র থামে অকস্মাৎ॥

৩১ মার্চ ১৯৪৬

সাপ

উজ্জ্বল, চিক্কণ, ক্ষিপ্র, লীলায়িত বিচিত্র জীবন
বিবরের অন্ধকারে খোঁজে পলায়ন।
বিশ্বের প্রথমজাত, ভবিষ্যের বিষাক্ত সন্তাপ,
পুরাণে অনন্তরূপী সাপ।

অমোঘ মৃত্যুর মতো ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়
কঠিন করাত-দন্ত যন্ত্রের নিষ্ঠুর দিগ্বিজয় ;
রাজধানী হ'তে ক্রমে শহরে পত্তনে
গঞ্জে ও বন্দরে হিংস্র বিতাড়ন মন্ত্র তারা শোনে।

খনিত্রে নিকুঞ্জ ধূলিসাৎ,
দূর্বাশ্যাম প্রান্তরের অন্তঃপুরে কে হানে আঘাত ?
শেষজাত মানুষ সন্তান
নিশ্ছিদ্র প্রস্তরে গড়ে সভ্যতার অলীক সোপান।

অরণ্যের মুক্তরাজ্যে শুষ্কপত্র আস্তীর্ণ নির্জনে
বর্ণের আলিম্প করি' পরিবর্তমান ক্ষণে ক্ষণে,
সৃষ্টির শাসন মানি প্রজননে গ্রাসে,
স্বধর্মে যে ছিল প্রাণোল্লাসে —
ক্রমশ বিলুপ্ত তার স্বাধীন নিঃশ্বাস,
নিয়ত আক্রান্ত —তবু আয়ুর প্রয়াস
প্রতিহিংসা খোঁজে বুঝি বিষে —
বিজিতের প্রতিশোধ তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্র দংশনে নিমিষে।

যেন রৌদ্র আর ছায়া, বিদ্যুতে ও জলধরে গড়ি'
কৃষ্ণ পীত স্বর্ণবর্ণে পৃথিবীর প্রথম কবরী
হয়েছিল মণ্ডিত কখনো,
তারপর ফুরাল কি বাসুকির শেষ প্রয়োজনও ?
ধরিত্রীর মাতৃক্রোড় হতে ক্রমে বঞ্চিত যাত্রার
কুটিল সর্পিল চিহ্ন অন্তরের উত্তরাধিকার
মানুষেরে দানপত্র করি'
ধরণী-ধারণ-ফণা রসাতলে খোঁজে বিভাবরী।
ত্রাসদন্তে কনিষ্ঠের চরিত্রের লয়ে সব পাপ
মৃত্যু-পথে অগ্রগণ্য সাপ।

উদ্ধত উদ্যত-ফণা, নির্বিষ সমাজ রক্ষা করি'
বিষদন্ত একাগ্নীতে, গর্বোন্নত, জাতির-প্রহরী
আজো কালান্তক বিষধর
দেহরজ্জু দিয়া বাঁধে জীবনের ভঙ্গুর নিগড়।

তবু কোথা পরিত্রাণ ?   আগত মানুষ জন্মেজয় ;-
সভ্যতার সর্পযজ্ঞে খসে' পড়ে নাগের বলয়
পৃথিবীর বাহুমূল হ'তে, .
রাজ্যগর্বী বিষকুম্ভ দীপ্তি পায় যজ্ঞের আলোতে।
প্রতিহিংস্র দুর্বলের লুকায়িত তীব্র অভিশাপ
মানবের অন্তেবাসী সাপ ॥

জুলাই ১৯৪৬

ছুটি

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
আকাশের আহ্বানের থেকে —
চাঁদের জাদুর থেকে কখনো দু'হাতে চোখ ঢেকে
সামান্যের বনচ্ছায়ে নিজেরে লুকাই।
মনে হয়, এই জীবনের খেলাঘরে
ধুলো-বালি-কাঁকরের মলিন অক্ষরে
সহজে বোঝার মতো, সহজে মোছার মতো
হিজিবিজি লিখে
ঢেকে রাখি চেতনাব অতল খনি-কে।
মনে হয়, অন্ধকারে ঘুরি,
মনেব সূর্যের সাথে
প্রাণের তারার সাথে
খেলি লুকোচুরি।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
সীমাহীন কল্পনাব থেকে
আকাশে উড়ন্ত যতো
চিন্তাকে সুদূরে ফেলে রেখে
জীবনের ক্ষীণ সুতো দু'হাতে গুটাই।

সহজ কথার আর সহজ কাজের জাল বুনে
কখনো নিশ্চিন্ত সুখে
স্মৃতির জমানো কড়ি গুণে —
ইচ্ছা হয়
আয়ুর এ ছোট ঘরে সংসার সাজাতে,
মনে হয় ভেসে যাই
অর্বুদ ঢেউয়ের সাথে সাথে।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই
অনন্তের বন্ধনের থেকে —
তৃপ্তিহীন দুরাশার অগ্নিবর্ণে গিরিভস্ম মেখে
নিজের সত্তার সব ঐশ্বর্যের দাম ভুলে যাই।
আত্মাকে আড়ালে রেখে,
কর্মের নিশ্ছিদ্র বিস্মৃতিতে
কর্তব্যের জনারণ্যে লতাগুল্মে চাই মিশে দিতে
আমার আমি-রে।
সুখে-ঘেরা অবসর খুঁজে ফিরি,
লুপ্তির তিমিরে।
সন্তোষের কপট নিদ্রায়
প্রাণের সখারে করি অপমান বৃথা ছলনায়।

মাঝে মাঝে ছুটি নিতে চাই—
হে অসীম, বিচিত্র, শূন্যতা!
প্রাণের সারথি!   দূর দিনান্তের অদৃষ্ট আঁধারে
অবিরাম যাত্রা শেষে
কতদূরে
ছুটি মোর কোথা?

জুলাই ১৯৪৬

খেয়া

মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ঝড় ওঠে প্রাণের পদ্মায়,
দুরন্ত আবেগ আনে উন্মাদনা উত্তাল উর্মির,
উচ্ছ্বাসের অন্যতটে সমধর্মা হৃদয়ের ভিড়,
ব্যাকুল আগ্রহে যেন আমারি আত্মার সঙ্গ চায়।
হৃদয়ের গতিবেগ প্রসারে উল্লাসে তীব্রতায়
সহস্র চিত্তের সাথে ব্যবধান রচে সুগভীর,
এ-তটে যে-অনুভূতি হৃদয়ের সঙ্গম-অধীর
দুঃসাহসে করি তারে উত্তরণ দুর্বল ভাষায়।

জীবনের অনুগ্রহে যতটুকু সম্পদ কুড়াই
আত্মায় আত্মায় করি নিবেদন ক্ষুদ্র সে সঞ্চয়,
ভাষার সঙ্কীর্ণ জীর্ণ তরী বেয়ে করি পারাপার।
উদ্বেল উচ্ছ্বাস-বন্যা উত্তরিতে ক্ষুদ্র ডিঙি বাই,
যেটুকু বিলাতে পারি প্রাণে প্রাণে সেটুকু অক্ষয়,
শুধু জানি এ-ডিঙায় ধরে না তো যেটুকু দেবার॥

মার্চ ১৯৪৬

যুধিষ্ঠির

দ্রৌপদী

প্রণিপাত আর্যপুত্র। আপনার ক্ষাত্রধর্মে আজ
ধর্মাশ্রয়ী তুমি। আজ তুমি দুর্জয় পাঞ্চাল-রাজ-
দুহিতার যোগ্য ভর্তা। ন্যায্য যেই রাজ-সিংহাসন
তার অধিকার তরে সপ্ত অক্ষৌহিণী দিতে রণ
তোমার পতাকা তলে সমবেত। তুমি নেতা, রাজা,
আজিকে উদ্বুদ্ধ তুমি অন্যায়েরে দিতে যোগ্য সাজা
অস্ত্রের দুর্জনবোধ্য সহজ ভাষায়।

যুধিষ্ঠির

— নহেক সহজ

প্রিয়তমে! দুর্জন বোঝে না কোনো ভাষা।

অর্জুন

হে অগ্রজ,

নিবেদন করি পদে —যে দুর্জন, সে বোঝে কেবলি
শক্তির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এ জগতে যারা বলী
দুর্বলেরে নিত্য করে অপমান নিঃশঙ্ক-নির্দয়
কুতূহলে। কিন্তু যদি যুযুৎসু নির্ভয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়,
শক্তিমদমত্ত পাপী পরিত্রাণ খোঁজে বন্ধুতায়
সন্ধিব কৌশলে। আর্য, বারংবার এ জীবনে তার
পেয়েছি নির্মম শিক্ষা। জননীর পূজা-উপচার
সম্পূর্ণ করেছি যবে স্বর্ণ-পুষ্প করিয়া লুণ্ঠন
কুবের ভাণ্ডার হ'তে, শক্তিহীন বিরাট গোধন
যেদিন করেছি রক্ষা দস্যুতার থেকে। মনে পড়ে
দ্যূতসত্যে বদ্ধ করি পাণ্ডবেরে পূর্ণ সভাঘরে
পাঞ্চালীর অপমান, শৃঙ্খলিত সিংহ লয়ে যথা
কাপুরুষ করে উৎপীড়ন। মনে পড়ে মর্মাহতা
দ্রৌপদীর আর্ত হাহাকারে রোষোন্মত্ত ভীম বীব
দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিল যেই ক্ষণে ভীষণ গম্ভীর
প্রতিহিংসা প্রতিজ্ঞার বাণী, সে মুহূর্তে হীনপ্রাণ
দুঃশাসন প্রাণভয়ে পাঞ্চালীরে ক'রে মুক্তিদান
ভীমের প্রতিজ্ঞা হতে খুঁজেছিল নিষ্কৃতির পথ।

দ্রৌপদী

কী লজ্জা! কী অপমান!

যুধিষ্ঠির

— ভয়ঙ্কর ভীমের শপথ
দুঃশাসনে পারে না গড়িতে সুশাসনরূপে। ধনঞ্জয়,
আপন শক্তিতে তুমি আপনার রচিয়া আশ্রয়
যদি মনে ভেবে থাকো পাপ শুধু প্রতিরোধনীয়
স্বার্থে আপনার, ভুল শিক্ষা ভুল ধর্ম তবে। প্রিয়,
পাঞ্চালীর লজ্জা অপমান, শুধু নহে পাঞ্চালীর।
যে-পারে পাণ্ডব-বধূ নির্যাতিতে দুর্বলের স্ত্রীর
কোথায় ভরসা তার হাতে? যে পারে অপেক্ষাকৃত
শক্তিহীন বিরাটের সম্পত্তি হরিতে, গৃধ্নুতা-বিকৃত
চিত্তে তার প্রজার রক্ষণ চিন্তা কোথা পাবে স্থান?
পাঞ্চালীর বিরাটের কুন্তী জননীর অপমান
পাণ্ডবের অপমান নহে, সে-যে এ বিশ্বের দুর্দশার
শোচনীয় প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। কৌরবেরে বারংবার
যে-শিক্ষা দিয়েছ পার্থ, শক্তির সে প্রাঞ্জল ভাষা কি
বুঝেছে কৌরব?

অর্জুন

কিন্তু, অন্য আর কোন পন্থা বাকি
আছে এ জগতে, যার অস্ত্রহীন নিষ্ক্রিয় প্রতাপে
অবিচার শান্ত হবে? বিকট, সন্ত্রাসী মহাপাপে
ফুটিবে পুণ্যের পদ্ম?

যুধিষ্ঠির

আছে বটে। পার্থ, নীলাকাশে
যে করে তোমর ক্ষেপ, মূর্খ সে; অস্ত্র যে ফিরে আসে
তারি দিকে পুনঃ। পর্বতে যে করে মুষ্ট্যাঘাত সে তো
নিজেরি বেদনা ডেকে আনে। সারা পৃথ্বীময় এতো
হিংসা, নিষ্ঠুরতা আর পীড়নেরে অতিক্রমি' তবু

আত্মার দৃঢ়তা বড়ো। কিরাতের বেশে শম্ভু প্রভু
তোমার অক্ষয় তূণ ব্যর্থ করেছিল বিনিঃশেষে
বিনা প্রতিঘাতে। যাঁর নিমেষের ইঙ্গিত-আদেশে
ত্রিলোক বিলয় হয়, তাঁর অস্ত্র বিঁধেছে কি বুকে
সে দ্বৈত সংগ্রামে?

অর্জুন

নহে আর্য!

যুধিষ্ঠির

তবু সে অদ্ভুত রণে
পরাজিত দম্ভ তব খণ্ড হয়েছিল সেই ক্ষণে।
আঘাত যে নিতে পারে অকুতোশঙ্কায়, অকাতরে,
জয় তারি।

দ্রৌপদী

ভুল, ভুল! আঘাতের নিষ্ঠুর হননে
বিক্ষত পাণ্ডব আত্মা; ক্ষত ক্লিষ্ট দ্রৌপদীর মনে
স্নেহ ক্ষমা দয়া অপগত। কিন্তু আজো পাণ্ডবের
জয় অনিশ্চিত। শুধু বহুবর্ষ ব্যাপী অন্যায়ের
প্রতিরোধে দাঁড়ায়েছে জাগ্রত পাণ্ডব, এ-ই মাত্র
অন্তিম সান্ত্বনা।

অর্জুন

নহে অনিশ্চিত কৃষ্ণা, জানি জয়
আমাদেরি। শ্রীকৃষ্ণ সারথি যেথা, যেথা ধনঞ্জয়
রথী, ভীম বীর সৈন্য পুরোভাগে, আর যুধিষ্ঠির
যে পক্ষের অধিনেতা, বিজয় সে পক্ষে কৃষ্ণা স্থির।

যুধিষ্ঠির

মিথ্যা এ দম্ভের আত্মপ্রতারণা। সব্যসাচী, যদি
শ্রেষ্ঠ শৌর্য আর অস্ত্রে মানুষের অন্তর অবধি

করা যেত বশীভূত, তবে মিথ্যা হোত সৃষ্টি, আর
ব্যর্থ হোত শাশ্বত জীবন। মানুষের অধিকার
পাশব শক্তির বশ্য নহে। বীরত্বের যে গৌরবে
প্রতিপক্ষে দেখ তুমি হীন, সে-গর্বেই তো কৌরবে
ঘিরে আছে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা। তবু জানি
বিশ্বজয়ী যত রথীবৃন্দ কৌরবের —হোক জ্ঞানী,
হোক পূজনীয়, তবু আত্মার সহায়হীন তারা।

অর্জুন

সংশয় কি আছে তবে জয়ে?

যুধিষ্ঠির

নহে পার্থ। দিশাহারা
ভ্রান্ত যেই জানে না নিজের সত্য, সেই বারংবার
হয় পরাজিত। জানি আমি আমাদের এ-যাত্রার
লক্ষ্য কল্যাণের, তাই জয় আমাদেরি। এ সংগ্রামে
ঘটে যদি অসম্ভব, হত হয় পার্থ, যার নামে
রক্ষ প্রকম্পিত সেই ভীম যদি করে আত্মদান,
যুধিষ্ঠির মরে যদি, তবু সর্ব মানব কল্যাণ
এ-সংগ্রামে সুনিশ্চিত ফল। পাপী যে, পার্থিব জয়
পার্থিব সমৃদ্ধি তার বারে বারে ভূলুণ্ঠিত হয়
আপন আত্মার পদাঘাতে।

অর্জুন

জয় তবে সুনিশ্চিত।
হে অগ্রজ, শুধু নয় গাণ্ডীব সহায়; সত্যাশ্রিত
পাণ্ডব আজিকে। ধর্ম যদি চিরজয়ী, ধ্রুব তবে
পাণ্ডবের রাজ্যলাভ।

দ্রৌপদী

রাজ্য-উপভোগ পুনরায়,
সর্বদুঃখ অবসান, সর্ব অপমান স্বপ্নপ্রায়
হবে অপগত। কী তৃপ্তি সে! সে কী সুখ!

যুধিষ্ঠির

তৃপ্তি বটে,
নহে সে সার্থক জিঘাংসার! কহ অকপটে
কৃষ্ণা, সিংহাসন সুখ দিতে পারে?

দ্রৌপদী

তবে কি বিজয়
পার্থিব সমস্ত সার্থকতা হতে চ্যুত?

যুধিষ্ঠির

তাও নয়,
পৃথিবীর মানবের সুখ শুধু রহে প্রাণে প্রাণে
সুকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনে। কুরুক্ষেত্র অবসানে
সে কর্মের সমাপ্তি, সে প্রাণে কর্তব্যের পুরস্কার
মহাশান্তি। আর কোনো কাজ নেই।

অর্জুন

তবে রাজ্য আর
প্রজা রক্ষা, সিংহাসন, রাজধর্ম, সে কি ত্যজনীয়?

যুধিষ্ঠির

রাজধর্ম যন্ত্রধর্ম। সামান্যের যোগ্য তাহা প্রিয়,
নহে কভু লক্ষ্যস্থল তোমার আমার।

অর্জুন

এর পরে?

যুধিষ্ঠির

এর পরে মানবের কল্যাণের তরে প্রয়োজন
ধর্ম রক্ষা, তার পরে মহাত্যাগ। এ শত্রু হনন
নহে শুধু স্বার্থসিদ্ধি তরে এই সত্য প্রমাণিতে
প্রয়োজন ত্যাগ আর মহাপ্রস্থানের। পৃথিবীতে
তাই ধ্রুব, যে কীর্তির মূল লোভ আর মোহমদে
খোঁজে না শিকড়।

অর্জুন

সত্যদ্রষ্টা আর্য, প্রণিপাত পদে ॥

এপ্রিল ১৯৪৬

চুরি

আলস্য-বিলাসে বুঝি কিছু নেশা জমেছিল বুকে,
সে-দুর্বল মনে তুমি কেন এলে অনধিকারিণী ?
অতিদূর অভিসার রজনীর কঙ্কন-কিঙ্কিনি
এখনো তোমার মোহ বারংবার ভাঙে সকৌতুকে ?
তোমারে গ্রহণ ক'রে কোথা রাখি ? —দুর্গম সম্মুখে
কণ্টকের অভ্যর্থনা ; প্রতিহিংস্র স্মৃতি-মায়াবিনী
ঈর্ষায় জাগ্রত, —জানি এ-জীবন তারি ঋণে ঋণী ;
কাম্যের সপত্নী স্মৃতি ঘৃণা করে এ নব-বধূকে।

তোমারেই ভালোবাসি। সত্য আজ শোনায় চাতুরি
বহুপ্রণয়ের জালে আবদ্ধ অতীত-ক্রীত মনে।
সঙ্গমাত্র আহরণ, তারপর তোমারে ফেরাই।
স্মরণের অবরোধ ছিন্ন ক'রে যতটুকু পাই
তোমার সান্নিধ্যে আসি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত চয়নে
দুর্লভ তোমার সাথে হৃদয়ের খেলি লুকোচুরি ॥

২৪ মে ১৯৪৬

আমি

রাত্রি আর প্রভাতের মধ্যবর্তী দুর্জ্জেয় সেতুর
অন্ধকার প্রান্তে আমি সম্মুখ-পথিক,
হেমন্তে উড্ডীন যেন শ্যামাকীট, ভ্রান্ত-দিগ্বিদিক,
শূন্য আস্ফালনে সুচতুর।

আমি ভোগী গৃধ্নু, তবু নমস্য শ্রদ্ধেয়,
আমি স্বর্গচ্যুত দেব, পাপ তবু সহায় আমার,
জোনাকির আলোবৎ সৌরদীপ্তি আমারি আত্মার,
আমার নিন্দিত যা তা অবশ্যই হেয়।

আমি সত্যবেত্তা, আমি মান্য ও মানিত,
আমি সুখ শান্তিদাতা ভবিষ্যতে, বর্তমানে যদি
আমার ইঙ্গিতে দুঃখ-দুর্দশার চূড়ান্ত অবধি
অন্যলোকে ভোগ করি' মোরে করে প্রীত।

আমি অন্ধ, তবু আমি পথের নির্দেশ করি দান,
হিংস্র আমি, শান্তি তবু আমারি কবলে,
একা আমি, তবু শ্রেষ্ঠ নির্বোধের দলে।
মানব-আত্মারে আমি যথা-ইচ্ছা করি অপমান।

সৌন্দর্যের ধ্বংসকারী, বিবেকের নিষ্ঠুর বিজেতা,
তবু আমি হৃদয়ের ঐশ্বর্যের একক ভাণ্ডারী,
দুর্বল, তথাপি আমি পৃথিবীরে ছিঁড়ে দিতে পারি,
আমি নেতা॥

আগষ্ট ১৯৪৬

কবিকণ্ঠ

স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি মাঝে মাঝে করি অতিক্রম,
আহার-মৈথুন-নিদ্রা-বিবর্জিত অনাবেগ দেশে।
বিদ্বেষ-জিঘাংসা-স্বার্থে সুগঠিত শতঘ্নী বল্লম
যেখানে নিরর্থ সবি, কখনো কখনো সেথা এসে
বীতরাগে বীতভয়ে এ-সংসারে করিতে বিচার
মৃত্যুর প্রচ্ছায়ে বসি' মুক্তি যদি পাই মুহূর্তেক,
ধন্য তবে কবি-জন্ম, ধন্য সত্য পানে অভিসার,
অর্ধ আত্মা পাপী যদি, পাপাতীত এখনো অর্ধেক।

হিংসার দেখেছি নগ্ন বিষদন্ত, দম্ভোদর-স্ফীতি,
ভ্রাতৃরক্তে কলংকিত সিংহনাদ শুনেছি বিস্ময়ে,
রাক্ষসী-ধর্মের ভক্ষ্য দেখি আজ স্নেহ-প্রেম-প্রীতি,
মনুষ্যত্ব ধর্মভ্রষ্ট, তবু বাঁচি এ সম্বল লয়ে।
আজো প্রাণে আশা জাগে, মেঘাচ্ছন্ন নিশ্ছিদ্র অমায়ো
অন্তিম বিনাশ আছে উষার আরক্ত চিতাগ্নিতে,
জীবনের প্রাপ্য যত লুপ্ত আজ শেষ চিহ্ন তারও,
তথাপি প্রাণের দীপে যত আলো সবি হবে দিতে।

মানুষের প্রাণে গড়ি' মানুষের প্রাণের জল্লাদ,
ক্ষণধ্বংসী রাজ্য করি' উপভোগ গ্লানিময় সুখে,
মানুষের ধর্মে জন্মি' ধর্মদ্রোহে করি সিংহনাদ,
তথাপি, মানুষ ব'লে, কিছু প্রীতি আজো বহি বুকে।
সেটুকু সম্বল শুধু যুগান্তের এ হিংস্র নিশায় —
সেটুকু শাশ্বত হোক কবিকণ্ঠে দৃঢ় প্রতিবাদে,
কৃষ্ণযুগে জন্ম যার, এই ব্রত বহে সে আত্মায়,
তারি কণ্ঠে বাঁচে আলো অন্ধকারে বিশ্ব যবে কাঁদে।

আমরা পীড়িত ক্লিষ্ট সঙ্গীহীন ; তথাপি আমরা
স্নেহ প্রীতি সখ্য নিয়ে কাব্য রচি, এ মোদেরি কাজ।
আমরা জানি না রাজ্য ধর্ম কিংবা শাস্ত্র ভাঙা-গড়া,
হৃদয়ের ধর্ম জানি, স্নিগ্ধ মুগ্ধ প্রণয়ে নিলাজ।
প্রাণের প্রস্তর যুগে যদি পারি কখনো পাষাণে
মনুষ্যধর্মেব অনুশাসনেব লিপি দিতে এঁকে,
তবেই সার্থক জন্ম, মৃত্যুজয়ী তৃপ্তি তবে প্রাণে
তবেই নির্দোষ মোরা নিরপেক্ষ নির্মম বিবেকে।

হে কবি, আহ্বান করি, মনুষ্যত্ব পিষ্ট ক্লিষ্ট যবে
তব ক্ষীণ কণ্ঠে আনো জীবনের অধিকার দাবি,
জীবন সংগ্রাম যদি, বলো এই জীবন-আহবে
একমাত্র অস্ত্র মোর আনন্দের মঞ্জুষার চাবি।
বলে কিংবা স্বার্থে কারো মানি না বিকৃত অধিকার
পৃথিবীরে ভুঞ্জিবার কুঞ্জে মম গড়িতে শ্মশান ;
বলো —'আমি ভালোবাসি' এই মন্ত্র কবচ আত্মার,
জীবনে যে হিংসা আনে প্রেমেরে সে করে অপমান ॥

১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

হার-জিৎ

দিকে দিকে চিৎকার —
জিৎ কার ?   জিৎ কার ?

প্রকৃতির পরাজয়, পরাজয় সত্যের,
নরকের কাছে আজ পরাজয় মর্তের,
হার আজ আমাদের সকলের পক্ষে,
মানবতা পরাজিত সবার অলক্ষ্যে,

শান্তির পরাজয়, পরাজয় তৃপ্তির,
অন্তরে পরাজয় বুদ্ধির দীপ্তির।
কোনোখানে জিৎ নেই, কারো নেই জিৎ আর,
তবু শুনি চিৎকার।

হার সব ধর্মের, হার যত সখ্যের,
প্রীতি আজ রূপ নেয় দিশাহারা ভক্ষ্যের
হার হয় আমাদের, তোমরাও হারো আজ,
কেন যে জেতার নেশা, খোঁজ নেই তারো আজ।
তবু শুনি চিৎকার —
জিৎ কার? জিৎ কার?

শয়তান পাশা খেলে, ঘুঁটি হয়ে মরি রোজ,
ঝলসে নরম মন নরকের বসে ভোজ।
আমরা কেবলি মরি, বার বার হেরে যাই,
জেতার নেশায় তবু বার বার তেড়ে যাই।
আমাদেরি মারি, দিই হারিয়েও নিজেদের,
তবুও কাটে না নেশা জেতবার এ জেদের।
তবু করি চিৎকার —
জিৎ কার? জিৎ কার?

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

বৈরাগ-যোগ

রিক্ততার গৈরিকেই স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের স্তুতি,
সম্পদের ঠুলি খুলে চোখে দেখি দ্যাবাপৃথিবীরে।
ইন্দ্রিয়-সম্বল দেহে ভোগের রোমাঞ্চ আসে ফিরে;
প্রাণ-যজ্ঞে সিদ্ধি আনে সঞ্চয়ের নিঃশেষ আহুতি।

যদি আজ নিঃস্ব আমি সঙ্গীচ্যুত, বিশ্বের বিভূতি
সত্তায় জড়ায়ে আছে সন্ন্যাস-ভস্মের মতো ঘিরে,
প্রাপ্তির বন্ধন খুলে নিঃস্বতার নগ্ন বিস্তৃতিরে
আত্মায় আয়ত্ত ক'রে প্রাণে লভি নব অনুভূতি।

মাটির পৃথিবী আর নীলাকাশ, কান্তার-প্রান্তর,
পুষ্পময় অন্তরীক্ষ, নক্ষত্রের ক্বচিৎ ইসারা,
পঞ্চেন্দ্রিয় পুষ্পপাত্রে চয়নের খুঁজি অবসর
আয়ুর পরিধি-বদ্ধ এ-জীবনে কভু পেলে ছাড়া।
কখনো আশ্রয়চ্যুত যদি পাই নিঃস্বতার বর
মুহূর্তে উন্মুক্ত হয় সংসারের অবরুদ্ধ কারা॥

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

আসল কথা

একটি আছে দুষ্টু মেয়ে,
একটি ভারি শান্ত,
একটি মিঠে দখিন হাওয়া,
আরেকটি দুর্দান্ত।
আসল কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
হঠাৎ ভালো হঠাৎ সেটি
দস্যি হয়ে ওঠে।

একটি আছে ছিঁচকাঁদুনি
একটি করে ফূর্তি,
একটি থাকে বায়না নিয়ে
একটি খুশির মূর্তি।

আসল কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
কান্নাহাসির লুকোচুরি
লেগেই আছে ঠোঁটে।

একটি মেয়ে হিংসুটী আর
একটি মেয়ে দাতা,
একটি বিলোয়, একটি কেবল
আঁকড়ে থাকে যা-তা।
আসল কথা দু'টি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
মনের মধ্যে হিংসে-আদর
চর্কিবাজি ছোটে॥

১৯৪৯

তিন ভাই বোন

ভোর থেকে সন্ধ্যা খেলা করে তিন ভাই বোন,
কিছুতে মানে না মানা মা যত ডাকেন 'শোন্ শোন্'।
তিন জন ভাই বোন দিন-ভর করে হুল্লোড়,
হাসির পাপড়িগুলি দমকা বাতাসে চলে উড়ে,
হাসির ফুলকিগুলি ঝরে পড়ে ঘাসের উপর —
হরিণ ছানার মত তিনজন খেলে রোদ্দুরে।
তিন জন ভাই আর বোন
কিছুতে দেয় না কান মা যত ডাকেন 'শোন্ শোন্'।

মা যত ডাকেন তত হাওয়া ডাকে 'শোন্ শোন্ শোন্',
হাওয়ার ছন্দে নাচে দুরন্ত তিন ভাই বোন ;

পাখির পালক যেন —হাল্কা শরীর,
পাখির মতন তারা ভারি অস্থির।

হাত ধরে নাচে তিন ভাই বোন—এলোমেলো চুল,
কখনো লুকোয় —যেন শরতের চাঁদ,
যেন তিন প্রজাপতি, তিনজন করে চুলবুল,
দুরন্ত তিনটিকে নিয়ে মা'র বিষম ফ্যাসাদ।

তিন জন ভাই বোন হয়রান করেছে মাকে,
'শোন্ শোন্' দুয়ারে মা মিছেই ডাকে,
রোদ্দুর হাওয়া আর মাঠের টানে
তিন ভাই বোন আর মানা না মানে।

১৯৪৮

রোদের গান

ওই মেঘ কেটে গেল উঠে গেলো রোদ,
রোদ এলো ঠিক যেন সোনালি আমোদ।
বৃষ্টির দুষ্টু টা বেয়াদব ভারি,
খিট্‌খিটে হিংসুটে মুখখানা হাঁড়ি।
কুচ্ছিত বিদ্‌ঘুটে মেঘ-দৈত্য,
কাজ নেই ফুর্ত্তি মিয়োনো বইতো!
সোনালি মেঘটা যেন রাজপুত্তুর —
মেঘ-দৈত্যটা ওর মহাশত্তুব;
নীলাকাশে হানা দিতে মেঘ যদি আসে,
তলোয়ারে কেটে দিয়ে রোদ্দুর হাসে।

ছ্যাখো ছ্যাখো মেঘ কেটে হোল ফর্সা,
হুটোপাটি খেলবার এলো ভরসা,
হুল্লোড় হুদ্দাড় মাঠ কাঁপিয়ে,
ঢেউ ঝলকিয়ে জলে পড়ো ঝাঁপিয়ে,
দৌড়ে লাফিয়ে চলো যত ইচ্ছে,
কালো মেঘ কেটে গেছে বিতিকিচ্ছে।
রোদ্দুরে খেলা আর রোদ্দুরে ছুটি,
দুহাতে কুড়াও রোদ ফেলো মুঠি মুঠি,
মন ভরে তুলে নাও তাজা মিঠে রোদ,
রোদ্দুরে হাসি-খেলা ফুর্তি-আমোদ।

রোদ্দুর সুন্দর ঝকঝকে মিঠে,
রোদ্দুর লাখো হাসি ছড়ায় মিনিটে।
রোদ্দুরে রং আলো পাখির আওয়াজ,
রোদের ফরাসে বাজে হাওয়া পাখোয়াজ
রোদের পাপড়িগুলি খসে পড়ে মনে,
আল্পনা কাটে রোদ মনের উঠোনে।
রোদ এলো হাসিমুখে ছ্যাখো তাকিয়ে,
রোদের আসরে এসে বসো জাঁকিয়ে,
রোদের পেয়ালা ধরে লাগাও চুমুক,
রোদের সোনার রঙে ভরে নাও বুক ॥

২২ জুন ১৯৪৬

একাচোরা

বাঁকাচোরা রাস্তায় একাচোরা সেন
হোগ্‌লার বেড়া এঁটে একলা থাকেন।
রাস্তায় পা দিলেই সস্তা খাতির
পাড়াতুতো খুড়ো জ্যাঠা ভাগ্নে নাতির,
একটুকু আস্কারা যদি দেওয়া যায়
বাড়িতে চড়াও ক'রে বসে আড্ডায়,
একাচোরা মশায়ের সয়না এ-সব
পাঁচজন লোক ডেকে নাচ-তাণ্ডব।

বন্ধু ও বান্ধব সন্ধান ক'রে
রাতদিন সাতপাড়া ঘুরে যারা মরে,
যারা যায় সিনেমায় আর পার্কে
তারা ছাড়া দুনিয়ায় বোকা আর কে?
সময়ের করে লোকে বাজে খরচা
আত্মজাহির আর পবচর্চা,
সেই হেতু সুচতুব একাচোরা সেন
দরমার বেড়া এঁটে ঘর্মে ভেজেন।

বাঁকাচোরা রাস্তার একাচোরা সেন
সবাকাব মান্য ও গণ্য বটেন।
ছেলেমেয়ে করে যদি হৈ হুল্লোড়,
দুদ্দাড় খেলাধুলো রাতদিন-ভোর,
বাপ-মা শিক্ষা দিয়ে বলেন তবে,
'ওঁর মতো শান্ত ও শিষ্ট হবে,
হোমরা-চোমরা আর গোমবা বটেন—
স্বদেশের গৌরব একাচোরা সেন।'

১৯৪৮

ছড়া

ছড়ায় ছড়া কে
বনের গাছে ঢেউয়ের নাচে
পাখির আওয়াজে !
বৃষ্টি ধারায় কে গেয়ে যায়
ঘুম-পাড়ানি ছড়া,
মুখের হাসি মনের খুশি
কোন ছড়াতে গড়া !
মাঠ পাহাড়ে দিঘির পাড়ে
ঘুঘুর ঝিঁঝির ডাকে
কেউ কি জানে সে কোন ছড়ার
ছন্দ জেগে থাকে ?

শিশির ঝরার হাল্কা ছড়া
মেঘের গুরু গুরু,
গাছের পাতার ঝির্‌ঝিরি আর
বুকের দুরু দুরু,
চলতি পথের ছন্দে লেখা
নতুন দিনের ছড়া,
নৌকো বাওয়ার হুল্‌কি ছড়া
আশার বোঝা ভরা,
ভোর বিকেলে নানান সুরে
হরেক ছড়া শুনি,
টুকরো গুলি কুড়িয়ে এনে
ছড়ার মালা বুনি ॥

১৯৫০

রান্নার কান্না

মির্জাপুরের মেসে অর্জুন রাঁধুনি
কার্যে রম্ভা তার বাক্যেই বাঁধুনি।
তরকারি রাঁধতে যে দরকার লঙ্কার
সেটা জানে বলে তার মস্ত অহঙ্কার।
গর্বে সে সর্বদা রেঁধে চলে তড়বড়,
মন্দ যে বলে সে-ই তার মতে বর্বর।
কেউ তার রান্নায় যদি কোনো দোষ ধরে
তক্ষুনি অর্জুন চটে ওঠে ফোঁস ক'রে।

বেপরোয়া অর্জুন রাঁধে মাছ মাংস,
হাঁড়িতেই কাঁড়ি-কাঁড়ি থাকে অধিকাংশ।
খায় না তা চাকুরেরা, খায় না তা বেকারে,
বেড়ালেরা দূরে থাকে, ঠেকে আছে শেখারে
শেষটায় চটে-মটে অর্জুন একলাটি
নিজেরি রান্না নিজে খেয়ে নিলো একবাটি ;
সেই থেকে অর্জুন ছেড়ে দিয়ে রান্না
বলে— এ রসুই খাওয়া কম্ম আমার না॥

দামু

যদিও উদর চলে চুরি আর ভিক্ষায়
তবু দামু সারাদিন সবার অধিক খায়।
আশে পাশে যাহা পড়ে
চুরি করে অকাতরে
মার খেয়ে পাশ করে ধৈর্য পরীক্ষায়।

কিছু খায় ছিনিয়ে সে কিছু চেয়ে-চিন্তে,
দাম দিতে ভোলে সদা সব কিছু কিনতে,
যায় আমজাদিয়া-ই
খায় দাম না দিয়াই,
লপসিটা চাখে হলে জেলের বাসিন্দে।

গাছেরটা খায় দামু, কুড়োয় তলারটা
নিজ-পর ভুলে বলে —'কে বা খায় কারটা' ?
কণ্ঠির মহিমায়
মোচ্ছবে পাতা পায়,
পৈতা গলায় দিয়ে জোটায় ফলারটা॥

জিজ্ঞাসা

যদি এই হৃদয়ের রঙটুকু নিয়ে কোনোদিন
বাতাস উদাস হয়, আকাশ রঙিন,—
শরতে কি বসন্তের কুহু-কাকলিতে
নতুন জন্মের স্বাদে দুঃস্বপ্নেরে চায় মুছে দিতে,
তবে কি এ পৃথিবীর ছদ্ম নটীবাস
শাস্ত্র শস্ত্র রাজনীতি বাণিজ্য-বিলাস
সেই মুহূর্তের অভিসারে
প্রাণের নিভৃতে এসে খসে প'ড়ে যাবে একেবারে ?

যদি এই ভেজা মাটি শিশির দূর্বায়,
অনেক বিপথে ঘুরে পা দু'খানি পথ খুঁজে পায় —
তবে কোনো প্রান্তরের পারে,
কিংবা কোনো ভুলে-যাওয়া নদীর কিনারে,

মানুষের প্রেমের কি সংসারের বিচিত্র কাকলি,
ধূসর পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম কিংবা শ্যাম বনস্থলী,
পুরাতন আকাশ কি পুরোনো তারারা,
ধ্যানের শাসন পেয়ে ছাড়া
হবে নত আমার এ হৃদয়ের পুরোনো পুঁথিতে
কোনো এক নতুন কবিতা লিখে দিতে ?

আমি সেই মুহূর্তেরে খুঁজে
শহরে বাজারে হাটে মাঠের সবুজে,
কখনো অরণ্যে, কভু রাজধানী-পথে জনতায়,
ঘুরেছি অনেক ক্লান্ত পায়।
রূপকাহিনীর মায়াপুরীতে নিভৃতে,
কত সোনা-ছাওয়া দিনে, কত হীরে-ছড়ানো রাত্রিতে,
সহস্রের স্রোতে ভেসে, কখনো বা নির্জন সৈকতে,
দ্বীপে ও মরুতে আর কত তীর্থপথে,
কখনো বা মিনারের চূড়ায় দাঁড়ায়ে
দেখেছি দু'চোখে খুঁজে, সম্মুখে পশ্চাতে ডানে বাঁয়ে,
শুধু মনে হয় —
বুঝি সে রয়েছে কাছে, বুঝি কাছে নয়।

হোল কতদিন !
সকালের রোদ আজ বিকালের ছায়ায় মলিন।
তবু জানি প্রাণের সে চরম জিজ্ঞাসা
আজো করে উত্তরের আশা

আকাশে বাতাসে চাঁদে, কখনো বা মানুষের ঘরে
পাখির আওয়াজে আর প্রণয়ের মৃদু কণ্ঠস্বরে।
হয়তো জীবনে কিংবা জীবনেরো বড় কল্পনায়
সে-মুহূর্ত আছে যেন, আছে প্রতীক্ষায়॥

১৯৪৭

হারানো নিমেষ

দিনগুলি সোনা দিয়ে মুড়ে,
মনের দিঘির জলে সারাদিন ফেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
অলস শরৎ,
ছোট ছোট ঢেউ ওঠে বালার মতন,
বড় থেকে বড় হয়ে ছেয়ে যায় মন,
মনের সীমানা ছেড়ে আরো দূরে যেতে খোঁজে পথ।
হৃদয়ের ছড়াবার, সুদূরে যাবার এই খেলা
কখন হারিয়ে যাবে নিভে গেলে শরতের বেলা,
মনের গভীর তলে নিথর আঁধারে
আশ্বিনের এ-আনন্দ হারা হয়ে যাবে একেবারে।

জীবনের ছোট ছোট অলস নিমেষগুলি ঘিরে
যত খেলা প্রতিদিন, সবি এক ভুলের তিমিরে
বারে বারে কেবলি হারায়,
তারপর শূন্য দিনে, বিষণ্ণ রাত্রিতে
হারানো এ-ক্ষণগুলি চাই ফিরে নিতে
খুঁজে ফিরি আকাশে-তারায়।

ছোট এই আয়ু, তবু বড় তার আনন্দের আশা,
ক্ষণিকের অনুভব ঘিরে তাই অফুরন্ত ভাষা।
হারানো নিমেষগুলি খুঁজে
মন তাই ঘুরে মরে জলে-স্থলে, নীলে ও সবুজে

যদি কোনোদিন কৌতূহলে
মনের ডুবুরি কোনো নামে এই হৃদয়ের জলে,
খোঁজে যদি মনের গহীন,
হয়তো সেদিন —
হারানো সহস্র ক্ষণ, অসংখ্য নিমেষ
পাবে সে উদ্দেশ।
যে-আনন্দ বার বার এ-হৃদয়ে কেবলি হারাই
সে-সম্পদে হয়তো বা হবে তার তরণী বোঝাই।

১৯৪৮

বৈকালী

এখন তো পৃথিবীর সব দেশ চেনা হয়ে গেছে,
সকল সৈকত, মরু, সব দ্বীপ, পাহাড় পেয়েছে
মনের চরণ চিহ্নগুলি—
তবুও দিনের শেষে কৌতূহলে ভরা এ-গোধূলি।

হয়তো বা কোনোদিন কোনো এক দূরের পাহাড়ে,
প্রান্তরে কান্তারে কিংবা আন্দোলিত সমুদ্রের ধারে
কৌতুকে লিখেছি দু'টি নাম —
সন্ধ্যার তিমির-ছায়ে এখনো কি আছে তার দাম ?
এখনো কি কোনো এক সুদূর বন্দরে
পরিত্যক্ত মুহূর্তেরা স্মৃতির জেটিতে ভিড় করে

সে-দিনের সে-মনের ফিরে আসা খুঁজে?
এখনো কি এ-হৃদয় প্রাপ্য তার নিতে পারে বুঝে?
যাযাবর যৌবনের দিনগুলি শুধু পথে পথে
প্রতিরাত্রে কোনো এক নতুন সরায়ে সুরাস্রোতে
পুরাতন মন ধুয়ে নতুন সঙ্গিনী নিল বেছে,
তারা কি এখনো আছে প্রতীক্ষার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে?
অথবা কি গোধূলির ধূসর সংশয়ে
সেদিনের প্রেমময়ী দেখা দেয় দ্বিচারিণী হয়ে?
তারার মতন স্থির, হীরকের মত শুচিস্মিত
সেদিনের কথাগুলি এখন কি মলিন, স্তিমিত?

ধূসর সন্ধ্যার ছায়ে দু'নয়নে দৃষ্টি আজ ম্লান,
কভু ভাবি সবি আছে, কভু দেখি নিঃস্ব এ-পরাণ।
তমসার জন্মান্তরে দিবসের উত্তরাধিকার
নিরুদ্দিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল এই মনে পাব কি আবার?

১৯৪৯

পাখি আর তারা

মলিন দিনের থেকে বিবর্ণ সন্ধ্যার ফাঁদ ছিঁড়ে
কোমল নিবিড় স্তব্ধ কোনো অন্ধকার নীড়ে
এখন পাখিরা শুধু চলে আর চলে আর চলে,
ধূসর স্মৃতির জীর্ণ জাল ছিঁড়ে যায় দলে দলে।
তবুও এ শহরের শাখায় শাখায় ওরা সারাদিন ছিল,
আমার এ দক্ষিণের জানালার কাছে বুঝি বিভ্রান্ত কোকিলও
একবার দুইবার তিনবার ডাক দিয়ে গেছে।
সোনার রৌদ্রের দিঘি ঘুরে ঘুরে এই ঘাট নিয়েছিল বেছে;

তাদের হয়েছে শেষ বিলাসের ক্ষণ,
আমার জগৎ থেকে ক্লান্ত তারা করে পলায়ন।

আমার হয়নি শেষ, আমার হয়নি শেষ, আমার হয়নি শেষ পাওয়া,
মেটে নাই আকাঙ্ক্ষার সব দাবি-দাওয়া।
আমি আজো ভালোবাসি, আজো ভালোবাসি ভালোবাসা,
দুর্নিবার উপভোগ বাসনার অক্ষুণ্ণ পিপাসা
আয়ুর মুহূর্তগুলি গেঁথে রাখে মালার মতন,
নিরন্তর মনে মনে শুনি জীবনের আমন্ত্রণ।

যত হৈম মুহূর্তেরা আসে এই প্রাণের কুটিরে
যাযাবর সেই সব অস্থির চঞ্চল অতিথিরে
কোনোদিন যেতে দিতে হয়।
দিবসের বন্ধু তারা, ম্লান সন্ধ্যা তাহাদের নয়।

এ বিবর্ণ দিন থেকে পলাতক তাই দলে দলে
চঞ্চল পাখিরা শুধু চলে আর চলে আর চলে।
তাদের ডানার ঘায়ে কম্পিত আকাশে
স্থিরজ্যোতি নক্ষত্রের ফোটার সময় হয়ে আসে॥

১৯৫০

প্রাংশুলভ্যে

কোনো এক সুদূর আকাশে
ছোট ছোট তারা যদি সূর্যপ্রভ হয়,
তবে স্ফুলিঙ্গের মতো যত তৃপ্তি এ-হৃদয়ে আসে
প্রাণের অনন্তলোকে তারা কি শাশ্বত সূর্য নয়?

সামান্য এ জীবনের উত্তরাধিকার,
ইন্দ্রিয়ের মাধুকরী একমাত্র সম্বল যাত্রার।
সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাঁধা সুখের পরিধি,
ছোট আশা আমাদের অনন্ত তৃষ্ণার প্রতিনিধি।
জীবনের ছায়ার প্রাচীরে
মনোরথ বারবার প্রতিহত হয়ে আসে ফিরে ;
গ্লানিভরা দিন,
স্বপ্নের সান্ত্বনা ভরা রাত্রিগুলি মূর্ছায় বিলীন।
আয়ুর আকাশ-ছাওয়া তুচ্ছতার কালি
যদি কভু ছিন্ন ক'রে আসে আনন্দের এক ফালি,
জ্যোতির্ময় সে-মুহূর্তে শুধু মনে হয় —
তারা যদি সূর্য হয়, এ-আনন্দ সূর্য কেন নয় ?

জীবিকার দুঃখ-সুখ চতুরালি ভরা যত দিন —
ভঙ্গুর প্রেমের ছোট আনন্দেরে করে প্রদক্ষিণ।
সেই ভালোবাসা আর ভালোলাগাটিরে
যত্নে রাখি ঘিরে
দৈনন্দিন জীবনের কঠিন নির্মোকে,
সে-আনন্দে সুর বাঁধি, সে-আলোয় দীপ্তি আনি চোখে
তারে ঘিরে সামান্য এ-ভাষা
উদ্বাহু বামন সম অনন্তের স্পর্শের প্রত্যাশা।

আজ মনে হয়,
যদি এ তৃপ্তির স্বাদ না পেতো হৃদয়,
যদি হৃদয়ের উপপ্লবে
এই ভালোলাগা আর ভালোবাসা মুছে যেত, তবে —

কেন্দ্রহীন এ-জীবন চিরন্তন ভ্রান্তির প্রলয়ে
যেত না কি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ?
তাই আজ জীবনের যত আবর্জনা
তারো মাঝে খুঁজে ফিরি ছোট এ সান্ত্বনা —
ছোট ছোট তারাগুলি কোনোখানে যদি সূর্য হয়,
প্রাণের অনন্ত নভে এ-আনন্দ সে কি সূর্য নয় ?

১৭ জানুয়ারি ১৯৪৮

কালোরাতের কবিতা

অন্ধকার নীরন্ধ্র কী হয় ?
রাত্রেও তো তারা ফোটে, নিশা মেঘে বিদ্যুৎ তো রয়।
তমিস্র জীবনে তাই আজো বুঝি কভু স্বপ্ন দেখি,
অন্ধকার বর্তমানে দীপ জ্বালি এখনো সাবেকি।
যখনি শরতে আসে নীলাকাশ, ফাগুনে দখিনা,
মনের সে দীপে খুঁজি কাঙ্ক্ষিতার সাড়া পাই কিনা।
অকস্মাৎ হৃদয়ের আলোড়নে স্নেহস্পর্শ পেলে
এখনো উৎসাহে ডাকি —'এলে ? তুমি এলে ?'

জীবনের দিবা হলে শেষ,
সূর্যের প্রখর আলো যখন নিঃশেষে নিরুদ্দেশ,
তখনো তো মনের পিপাসা
কেঁপে কেঁপে খুঁজে ফেরে চেনা মুখ, পরিচিত আশা।
তারা কি ফেরে না আর ? মিছে কথা। কত শতবার
কত শুভদৃষ্টি মাঝে জীবনের ঘোচে অন্ধকার।
কত লগ্ন দর্পণের মত
পিছনের আনন্দটিরে ক'রে তোলে মুহূর্তে জাগ্রত।

যেমন জীবন দিয়ে উষায় মধ্যাহ্নে দ্বিপ্রহরে
আলোরে বেসেছি ভালো, সেই তীব্র আসক্তি অন্তরে
আঁধারেও তেমনি উদ্দাম,
এখনো নক্ষত্র আছে, তুল্যহীন সে আলোরও দাম।
এখনো সমস্ত সত্তা আশা প্রেম স্বপ্ন স্মৃতিময়,
হীরক খচিত রাত্রি —সে কি কভু রন্ধ্রহীন হয়?

১৯৫০

নেশা

আফিঙের লাল ফুলে যেন এক অলস মৌমাছি
স্বপ্ন দেখে আর দেখে। শিহরিত পাখার রেশমে
রোদের সোনার বুটি বুনে যাওয়া শেষ হয় ক্রমে,
সূর্য বুঝি গেল চলে পশ্চিম-প্রান্তের কাছাকাছি।
ভুলের সুতোয় গাঁথা জীবনের সরু মালাগাছি
এখনি শুকায়ে যাবে সংসারের সর্বভুক হোমে।
আয়ুর প্রবাহে আঁকা যত ছবি স্বপ্নের কলমে
যতক্ষণ না হারায়, মনে হয় যেন বেঁচে আছি।

রামধনুরঙে মেশা এই নেশা অভিশাপ আনে,
ব্যর্থতায় মুছে যায় ধর্ম-অর্থ-সমাজ-সংসার
ভুলের দ্বিতীয় স্বর্গ তবু গড়ে চলি বারবার,
স্রষ্টার যে প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তি তার আছে কোনখানে?
কৃতিত্বে কি কর্মে যার নাই দাম, নাই কোন মানে
নেশার সে নির্বাসনে খুঁজি চিরন্তন অধিকার॥

১৯৪৭?

স্বীকৃতি

কখনো মুহূর্ত কোনো সবিতার দীপ্তি নিয়ে আসে,
নতুন পৃথিবী গড়ে নব সৌরতেজের উল্লাসে।
পুরাতন জগতেরে অস্পষ্ট সুদূর মনে হয়,
লগ্নে লগ্নে নবজন্ম, নব নব দৃষ্টির বিস্ময়।

এ অরণ্যে একদিন ঝড়ে
আকাঙ্ক্ষার শাখাগুলি উদ্দাম হয়েছে বায়ুভরে।
সেদিন সে লুপ্ত ক্ষণ হয়তো এনেছে
অনেক কথার ফুল ঝরে-পড়া সব ফুল বেছে।
সহসা তাকায়ে পিছে আজ যদি দেখি —
মনে হয় সেই ফুল এ হৃদয় আজো রেখেছে কি ?
ছেঁড়া কথা শরতের মেঘের মতন
এক পাশ জোড়া দিতে ছিঁড়ে যায় অন্য এক কোণ।

তবু এই ধরণীরে নিত্য নব রূপে দেখেছি যে
এ জীবনে সে সৌভাগ্য কী যে,
কী যে তার দাম,
সামান্য সে স্বীকৃতিরে হেথা রাখিলাম।
আজো কোনো মুহূর্ত যে নিয়ে আসে অন্তর কথা
জীবনের কানে কানে নবরূপা পৃথ্বীব বারতা,
সেই তো এ জীবনের সৌভাগ্য অপার।
কথারা হারায় যদি হৃদয় তো জন্মে বাব বার॥

১৯৫১

পতঙ্গবৃত্তা

শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় ভোগসঙ্গী হে মোর ধরণী !
কখনো হত্যার রক্তে কলঙ্কিনী, কভু নিপীড়িতা,
কভু বীরভোগ্যা, ভ্রষ্টা, মিথ্যাময়ী নিষ্ঠুর বনিতা,
বিচ্ছিন্ন করেছ আত্মা, তবু তুমি প্রাণের ঘরণী।
সহস্র বঞ্চনা মাঝে ক্ষণিক প্রসাদটুকু গণি'
সে-ক্ষুদ্র তৃপ্তিরে ঘিরে গেয়ে চলি জীবনের গীতা,
সহস্র-চারিণী তুমি উদাসিনী, অন্তরে জানি তা,
তবু, হে ইন্দ্রিয়ভোগ্যা, জীবনের তুমি মধ্যমণি।

বিক্ষুব্ধ, বিক্ষত আমি এ-প্রেমের শাশ্বত আঘাতে,
ক্ষণে ক্ষণে ব্যর্থ লগ্ন, পদে পদে গ্লানির বেদনা,
মহার্ঘ্য আয়ুর মূল্যে যা দিলে কৃপণ করুণাতে
সামান্য সে, তবু জানি তারি লাগি দীর্ঘ দিন গোণা।
এখনো বাঁচার নেশা পৃথিবীর প্রেমের সভাতে,
আকাঙ্ক্ষার ফুলে আজো তোমারি কণ্ঠের মালা বোনা॥

১৯৫০ ?

ভালো লাগা

এই ভালো, জীবনের ভালো-লাগা ভুলগুলি নিয়ে
খুশির শেফালি বনে বেঁচে থাকা ছন্দ কুড়িয়ে।
জীবনের পাঠশালে যত পড়া সবি এলোমেলো —
কিছু হোল ভুল শেখা, কিছু ভুল মানে নিয়ে এলো।
কেবলি খেলার মোহে পৃথিবীর উঠোনে বাগানে
পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে দিন কেটে গেল গানে গানে।

নামতার ছড়াগুলি কবিতায় হোল একাকার,
জীবনের অভিধান না বোঝায় বোঝা গুরুভার।
তবু এ-ই ভালো লাগে, আমার এ প্রিয় ভুলগুলি,
ভুলের আবিরে রাঙা অপরূপ জীবন-গোধূলি।

কত পথ হোল চলা! পথে পথে ছিল বুঝি আঁকা
মহাজন-পদাবলী, তবু পথ হোল আকাবাঁকা।
বনপথে কত চারু চরণের ছায়া খুঁজে খুঁজে
নতুন ভুলের দিকে কতবার গিয়েছি তবু যে।
কতো নীল দিন আর কত যে নিবিড় তমসায়
ঝরা-ফুল খসা-তারা গেঁথে গেঁথে দিন কেটে যায়।

ভালো লাগে ভালো লাগে —এই কথা গুন্ গুন্ করে
আসে মন ভ'রে।
মন ভ'রে আসে যেন শ্রাবণের নদী,
প্রাণ ভ'রে ছুঁয়ে যায় চেতনার সীমানা অবধি,
অসীম খুশির সুর গুন্ গুন্ ক'রে
আসে মন ভ'রে।

এই খুশি ভুল যদি, এই পাওয়া ভুল যদি হয়,
তারাভরা রজনীতে মায়া বোনা যদি অপচয়,
তবু তো সে ভুলের খুশিতে
প্রাণের প্রদীপ জ্বলে উদাসী আমার পৃথিবীতে।
যদি ভুল হয় —
ধ্রুব বলে মনে হওয়া মিছে কথা শুধু গুটি কয়,

তবু সেই ভুলগুলি জীবনের থেকে মুছে নিলে
সকল খুশির আলো নিবে আমার নিখিলে।
তাই এ-ই ভালো লাগে, জীবনের ভুলগুলি নিয়ে
খুশির শেফালি বনে বেঁচে থাকা ছন্দ কুড়িয়ে॥

১৯৪৭

ভ্রান্তিবিলাস

আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিষ্ঠুর হাওয়ায়
নিষ্ফল মেঘের মতো হৃদয়ের আকাশে মিলায়।

আয়ুর পরিধি হ'তে অবাধ্য বাহুতে
মৃত্যু-তীর্ণ কল্পনারে ছুঁতে
বারংবার অক্লান্ত প্রয়াসে
কামনা স্তিমিত হয়ে আসে।
স্বভাবত উচ্ছৃঙ্খল মন, তবু কঠিন শাসনে
রাত্রিদিন রেখে সন্তর্পণে,
সংশয়ের বিভীষিকা আনি'
উন্মুক্ত দৃষ্টির পরে কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা টানি'
গড়ে চলি এতটুকু নীড়।
যেখানে অসংখ্য ছোট নির্জীব আশার শুধু ভিড়
সেখানে মলিন শয্যা পেতে
আত্মপ্রসাদের তীব্র সুরার ভ্রান্তিতে থাকি মেতে।

আমার এ-উপদ্বীপে যাযাবর তাতারের মতো
নিষ্ঠুর দুর্দমনীয় প্রেম এলো কত!
এলো কত দুর্নিবার উদ্ধত বাসনা,
সম্ভ্রমের রুদ্ধদ্বারে অবজ্ঞায় হোল অভ্যর্থনা।

তারপর সুখ খুঁজে খুঁজে
রাত্রিদিন স্রোতে ভেসে চলি চোখ বুজে ;
সর্বগ্রাসী আগুন নিবাতে
হৃদয়ে শ্রাবণ আনি নিদ্রাহীন রাতে।

মাঝে মাঝে শুনি যেন আর্তনাদ কার !
অকস্মাৎ মনে হয়, ভেঙে দিয়ে দ্বার
বিদ্রোহী কল্পনাগুলি যদি কোনোমতে
সহসা ছড়ায়ে পড়ে সত্তাব্যাপী বিস্তীর্ণ জগতে,
তবে কি সে দাবাগ্নির উদ্দাম আহবে
প্রাণের এ আয়োজন ভস্ম হয়ে গিয়ে ধন্য হবে ?

১৯৪৭

সাধারণ

সাধারণ হাবভাব, সাধারণ হালচাল সবি,
সাধারণ আচরণ, একজন সাধারণ কবি।
সাধারণ আশাগুলি সাধারণ ভাষা দিয়ে বলা,
সাধারণ হাসি আর কান্নার সিধে পথে চলা।
সাধারণ জীবনের ব্যথা আব উল্লাস নিয়ে
ছোট ছোট কথা গেঁথে চলা শুধু ছন্দ বানিয়ে ;
সাধারণ মন নিয়ে হৃদয়ের খোলা দরবারে
সকলের সাথে মিশে এক হয়ে যাওয়া একবারে।

আকাশের পরপারে জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে,
মনীষার ছায়াপথে কত কথা গিয়েছে হারিয়ে,
বিন্ধ্যের কত চূড়া পথে যেতে জয় আছে বাঁকি,
সব অসাধারণের ছায়া থেকে দূরে দূরে থাকি।

সাধারণ আকাশের সনাতন চাঁদ আর তারা,
সাধারণ প্রণয়ের রাত্জাগা চোখের পাহারা,
চলমান জীবনের খুঁটিনাটি মান অভিমান
তাই দিয়ে বোনা শুধু কতগুলো সাধারণ গান।

সাধারণ মানুষেরা হয়তো কয়েকদিন পরে
চলে যাবে সময়ের সাধারণ সিধে পথ ধ'রে,
আসবে হয়তো সব অনন্যসাধারণ লোক—
যুগান্ত কল্পের অদ্ভুত মেয়ে ও বালক।
হয়তো সেদিন প্রেম হবে অসাধারণ কত না!
তার সাথে একটুও জীবনে হবে না জানাশোনা।
রাতের আঁধারময় বন্যা কি আসবে তখনো?
সে-বানে কি ডুববে না মনের বিজন দ্বীপ কোনো?

আমরা যে সাধারণ সেই কথা যত মনে ভাবি
প্রকৃতির রাজকোষে ততবার খুলে যায় চাবি,
শরতের নীলটুকু ততবার চোখের তারায়
আপনারো অজানিতে কখন চকিতে মিশে যায়।
সাধারণ গৃহতলে বধূর হৃদয়টুকু ঘিরে'
মনে মনে মালা গড়ি আকাশের তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে।
সে তারা কি নিবে যাবে এ-হৃদয় মুছে যায় যদি?
অনন্যসাধারণ থাকবে কি প্রলয় অবধি?

কত কথা শেখা হোল, কত পুঁথি পড়া হোল শেষ,
কত ইতিহাস এসে চলে গেল। কত মহাদেশ
গৈরিকে, কখনো বা উজ্জ্বল বর্শার ধারে,
কত অনুশাসনের লিপি গেল লিখে বারে বারে।

তবু এই সাধারণ নীড় —সে তো মানে না শাসন,
পুরোনো স্নেহের মোহে চিরদিন রয় সাধারণ,
ছোট ছোট সুখ আর দুঃখের আল্পনা এঁকে
অনুশাসনের যত ক্ষত রাখে ভুল দিয়ে ঢেকে।

আমরা যে সাধারণ —গৃহে, আর সাধারণ —প্রেমে,
মাঠে-ক্ষেতে-নদীতটে-বস্তিতে-কুঞ্জে-হারেমে,
সে-ই শুধু আমাদের পরম-চরম পরিচয় —
ঘূর্ণিত সংসার-চক্রকীলক শুধু নয়।
এই রথ চলে যাবে, গুঁড়ো হবে চাকা একদিন,
পথে পথে ক্ষয় হয়ে ইতিহাসে হবে সে বিলীন।
তখনো কি সাধারণ গৃহে কোনো মানব-মানবী
খুঁজবে না কোনোখানে একজন সাধারণ কবি ?

২০ আগস্ট ১৯৪৭

ভয়

শাস্ত্রের প্রশস্ত পথে, সংস্কারের কবচে দুর্জয়,
মানুষের মর্মচ্ছেদী রুধিরের সঞ্জীবনে বলী,
রাজধর্মে পুরস্কৃত, শূদ্রত্বে ও দারিদ্র্যে অক্ষয়,
সভ্যতার দিগ্বিজয়ী চলে আত্মা দলি’।
অসূর্যম্পশ্যা যে চিন্তা, সে-ও ক্ষুব্ধ আড়ষ্ট শাসনে,
ভাষা ক্লিষ্ট, কর্ম পঙ্গু, সঙ্কুচিত প্রাণ,
রাষ্ট্রে ও সমাজে, প্রেমে, জন্মে ও মরণে,
ভয় সর্বাধিক শক্তিমান্।

জীবনে সে চক্রবর্তী, অধিকাংশ আয়ু তার দাস,
স্বপ্নে কিংবা জাগরণে, প্রমোদে অথবা জীবিকায়,
ব্যাহত বিক্ষুব্ধ করি স্বাচ্ছন্দ্যেরে করে সে বিলাস,
নির্জনে সে কভু আসে, কভু জনতায়।
মৃত্যুর মুখোসে আসে, কখনো বা অপমান রূপে,
কখনো নিন্দায়, কভু রাষ্ট্রের নিষেধে,
উড্ডীন মনেরে লয়ে বারংবার ফেলে অন্ধকূপে —
গতিরে সন্দেহ দিয়ে বেঁধে।

অশরীরী সরীসৃপ —নাগপাশে জড়ায় জীবন,
আঁধারের গুপ্তচর —আড়ি পাতে মনোবাতায়নে,
চরিত্র ও কামনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে করে বিচরণ,
আত্মায় সে পারত্রিক, লৌকিক সে মনে।
অন্তরে প্রবেশ করে লোভের সশস্ত্র পাহারায়,
ত্রিপাদে আচ্ছন্ন করে স্বর্গ মর্ত্য আর রসাতল,
দুর্বার বর্গির মতো প্রাণের চতুর্থ মূল্য চায়,
মুক্তিহীন হিংস্র সে কবল।

মৃত্যু-ভয় ? আয়ু বুঝি জীবনের সর্বোত্তম প্রেয় ?
রাষ্ট্রভয় ? ব্যক্তি বুঝি সতরঞ্চে হীন ক্রীড়নক ?
প্রেতভয় ? বর্তমান —সে কি অতীতের চেয়ে হেয় ?
লোকভয় ? নিন্দুক কি আত্মার চালক ?
তাই বুঝি সত্য ! তাই ক্লিষ্ট প্রাণ, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস,
অভিশপ্ত সত্তা ঘিরে' গ্লানির কালিমা।
সম্মুখে সবিতা, তবু দু'চোখে ঘনায় অন্ধ ত্রাস,
জীবনের খুঁজি ছোট সীমা।

আত্মার প্রত্যয় যেন ক্রমে জীর্ণ, কম্পিত, শিথিল,
সত্যের স্বরূপ ক্রমে অস্পষ্ট, অদৃশ্য হয়ে আসে,
নিবাপদ পিঞ্জরের গণ্ডিতে মানুষ আঁটে খিল,
অস্তিত্বে সান্ত্বনা খোঁজে আয়ুর তরাসে।
ছায়ার দানব যেন গড়ে প্রদীপের ক্ষুদ্র শিখা
আপনারে বন্দী করে আত্মজ আঁধারে,
প্রাণের দীপ্তিরে ঘেরি রক্তবীজ জন্মে বিভীষিকা
তথাপি সম্রাট মানি তারে।

জীবন্মৃত এ-জীবনে মিছে রচা স্বাতন্ত্র্যের বেদ,
মিথ্যা প্রণয়ের ক্ষীণ রক্তশূন্য নির্জীব উচ্ছ্বাস —
ধূলির দুর্গের মতো না ধ্বসিলে ভীতির বনেদ,
চিত্তে চিত্তে ত্রস্ত যদি নাহি হয় ত্রাস।
সত্য যদি মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে ভীতির ভ্রূকুটি,
আশঙ্কাব খল যদি সিংহচর্মে বাঁচে,
চিন্তা যদি না দাঁড়ায় সমুন্নত গর্বভরে উঠি',
অবশিষ্ট জীবনে কী আছে?

সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

খাণ্ডব দাহন

ভস্মসাৎ হয়ে যায় মহারণ্য, ছোটে জীবদল —
ভল্লুক-শার্দুল-সিংহ-হস্তী-সর্প-নকুল-গণ্ডার —
বিভ্রান্ত যে দিকে ছোটে সম্মুখে নিষ্ঠুর দাবানল
বুভুক্ষু জিহ্বায় করে লালসার উল্লাস উদ্গার।
নীড়ে নীড়ে পক্ষিদল ডিম্ব আর শাবকের 'পরে
দুর্বল দু' পাখা মেলি আর্তনাদে প্রাণ ভিক্ষা চায়,
দেবতা তৃপ্ত্যর্থে আজ গাণ্ডীবীর অগ্নিময় শরে
লক্ষ লক্ষ জীবাশ্রয় খাণ্ডব অরণ্য পুড়ে যায়।

শ্বাপদ-শকুন্ত আর সরীসৃপ পতঙ্গ উদ্ভিদ —
নগণ্য জীবন এরা অবান্তর সৃষ্টি এ জগতে।
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রাজপুত্র, শাস্ত্র-শস্ত্রবিদ্,
কোথা পশু-পক্ষী-কীট, হীনযোনি সর্বধর্ম মতে।
কুরু-সিংহাসন তরে কোনো হত্যা-প্রতিযোগিতায়
এ সামান্য জীবদের কখনো হবে না প্রয়োজন,
উৎসবে ব্যসনে রাষ্ট্র-দ্বন্দ্বে কিংবা মন্ত্রণা-সভায়
যে-জীবন অবান্তর তুল্য তার বাঁচা ও মরণ।

তাই এই ধ্বংস-যজ্ঞ ন্যায়ে ধর্মে সর্বথা সম্মত,
তাই হে অর্জুন, তুমি মহাকীর্তি পুরাণ-নায়ক।
দুর্বলের উৎপাটনে জগতে থাকে না কোনো ক্ষত,
কীর্তি তত সুমহান্ যত তীক্ষ্ণ মারণ-শায়ক।
কোটি জীবনের পণে বীর্যবান নিত্য খেলে পাশা,
যুগে যুগে যত খেলা তত ঘোচে ধরণীর ভার,
হারে-জিতে নেশা বাড়ে, বেড়ে চলে জেতার পিপাসা,
নির্বোধ পণের বাজি তবু মূঢ় জন্মে বার বার।

তাই এ খাণ্ডব যদি ধ্বংস হয়, লক্ষ লক্ষ প্রাণ
হে পার্থ, তোমার কীর্তি ক'রে দেবে আরো সুবিপুল।
সেই ভালো, শান্ত নভে থেমে যাক পাখিদের গান,
নগণ্য জীবন-লীলা হয়ে যাক নিঃশেষে নির্মূল।
জীবনের অবশিষ্ট চিহ্ন থাক এক মুঠো ছাই,
কালান্তক ধনুর্ধর তুমি লভ দৈব আশীর্বাদ।
খাণ্ডবের হত্যালীলা ঘোষুক তোমার মহিমাই
বীরের খ্যাতির গর্বে ডুবুক হীনের আর্তনাদ।

কয়েক প্রহর আগে, এখানেও ছায়াচ্ছন্ন নীড়ে
সহজ বাৎসল্য-প্রেম, আশা-স্বপ্ন, শৈশব-যৌবন,
সবি ছিল প্রাণোচ্ছল, ছিল মূঢ় জীবনেরে ঘিরে
আনন্দের আকাঙ্ক্ষার স্পন্দিত ছন্দিত আবরণ।
স্রষ্টার খেয়ালে গড়া বিচিত্র বর্ণাঢ্য ছিল প্রাণ,
ছিল তৃপ্তি কামনার, উপভোগ ছিল ইন্দ্রিয়ের,
শান্তি ও সংগ্রামে মেশা দুঃখ-সুখ পতন উত্থান,
এখানেও উর্মি ছিল অফুরন্ত জীবন স্রোতের।

সৃষ্টিকর্তা বিধাতারো আছে বুঝি কিছু লজ্জাবোধ
ক্ষণিক ভ্রান্তির বশে অবান্তর জীবন-সৃজনে,
মানব-শক্তিরে তাই সেও বুঝি করে তোষামোদ,
ধ্বংসের প্রেরণা আনে ক্ষীণজীবী মানুষেরি মনে।
যতবার জীবদল একান্তে ভঙ্গুর নীড় রচে
ইতিহাস রথচক্রে ততবার চূর্ণ হয়ে যায়,
ধ্বংসকর্তা বেঁচে রয় সর্বকালে কীর্তির কবচে,
জীবনের গড্ডলিকা ছোটে তারি প্রসাদ আশায়

তাই বুঝি আগুনেরো অগ্নিমান্দ্য, নিষ্ঠুর তামাশা!
অর্জুন, সামান্য জীব নাশ তরে কেন অজুহাত?
দুর্বল যে অসহায়, জানে না যে দেববোধ্য ভাষা
তার মৃত্যু ধরিত্রীরে বিন্দুমাত্র করে না আঘাত।
কুরুক্ষেত্রজয়ী পার্থ যুগে যুগে কীর্তিমান্,
লুপ্ত খাণ্ডবের নাম ধন্য হবে অর্জুনের সাথে,
আর যে পরাস্ত মৃত, স্মৃতি তার রাখে না সম্মান,
অস্তিত্বের চিহ্ন তার কোনোখানে থাকে না ধরাতে।

নিগূঢ় ধর্মের তত্ত্ব, বীরভোগ্যা পৃথিবীর রীতি,
তোমার দারুণ কর্মে হে পার্থ জ্বলন্ত বর্ণে লেখা।
কলঙ্ক ভূষণ তার সর্বাধিক শক্তিতে যে কৃতী,
জীবনই কলঙ্ক তার দুর্বল যে অসহায় একা।
কৃতীর সকল পাপ ধুয়ে যায় স্তুতির জোয়ারে,
দেবতার আশীর্বাদ তারি পরে ঝরে চিরকাল,—
বিধাতার সৃষ্টিরে যে নিজ বলে মুছে দিতে পারে,
বলিষ্ঠ বাহুতে পারে ফেলে দিতে ধরার জঞ্জাল।

হে পার্থ, হে সব্যসাচী, কৃষ্ণসখা, দেবেন্দ্রের প্রিয়,
নারায়ণ অংশ তুমি, ঈশ্বরের নর-প্রতিকৃতি।
জীবনের আসক্তিতে ভুলে থাকি কেবলি যদিও
তবুও তোমার কর্মে আছে জানি স্রষ্টার স্বীকৃতি।
বিধাতা প্রেরিত বীর দিগ্বিজয়ী আসে ভেঙে দিতে
অহেতু খেলায় গড়া সৃষ্টির তাসের ঘর বুঝি,
তবু যত বহ্নি জ্বলে, অগ্নিশিখা ঘেরে চারিভিতে,
তত মোরা মাঠে-ঘাটে ঘর-বাঁধা খড়-কুটো খুঁজি॥

১৯৪৮

অশান্ত

আমার শান্তি কোথায় লুকায়ে থাকে?
উড়ে যায় কোন দূর বাসনার ডাকে?
কোন দুর্জ্ঞেয় দুস্তর দেশে লুকাল আমার ঘুম?
জাগ্রত তাই রাত্রি, যদিও ধরিত্রী নিঃঝুম।

এখনো তো কত গাছের ছায়ায় বিরাম-শয্যা পাতা,
এখনো তো কত অলস দুপুর ঘুঘুডাকা সুরে গাঁথা।

এখনো তো কত নতুন ঘরের শীতল শয্যাতলে
অণুবজ্রের দম্ভ ছাপায়ে মৃদু কথা কারা বলে।
এখনো তো ফোটে ফুল
শরতের মেঘে চকিতে এখনো সংসার হয় ভুল।

আজিকে আমার মনেব শান্তি আকাশে বাতাসে খুঁজি,
স্মৃতির সোনার খাঁচা খুলে রেখে কতবার চোখ বুজি,
কথার শিকলে বাঁধি তৃপ্তির ছায়ার বিহঙ্গম,
তবু এ চিত্ত চঞ্চল জঙ্গম।

আমার শান্তি সে কোন দূরের নীড়ে
উড়ে চলে গেল ফেলে রেখে ক্লান্তিরে॥

১৯৫০ ?

স্মারক

পৃথিবীব জঠরাগ্নি একদা ফুঁসেছিল নাকি ভারি,
বিজ্ঞরা ক'ন, দুই গোলার্ধে সেই থেকে ছাড়াছাড়ি।
ভূলোকের মানচিত্র সেবার বদলেছে আগাগোড়া,
অকাল প্রলয়ে ডুবেছে অনেক গাছপালা হাতী-ঘোড়া।
সেই এলাকায় ঘরের খাঁচায় নর-নারী-শিশু মিলে
যত ছিল প্রাণ, সবি সে প্রলয় নিয়েছিল নাকি গিলে।
হিসেব খতিয়ে তবু ছ্যাখো, ক্ষতি হয়নি তেমন বেশি,
ইতিহাস বলে সেই ঝাঁকুনিতে লভ্যই শেষাশেষি।
গোটা হিমালয় উঠেছে সেবার নিয়ে বড় বড় চূড়া,
জমিটা যদিও ডুবেছে অতলে, দাম পাওয়া গেছে পুরা।

দুনিয়ার আর সৃষ্টির এই গূঢ় তাৎপর্য হে
সর্বংসহা ধরণীর বুকে সকল ভাঙাই সহে।
কিছু সয়ে যায় নিরুপায়ে কিছু ক্ষতিপূরণের লাভে,
খেয়ালী মালিক ভাঙেন গড়েন, বাঁচা তো তেনারি তাঁবে।
শুনি তাঁর চোখ নীলাকাশ জোড়া, ছোটখাট লাভ-ক্ষতি,
অত বড় চোখে দেখাই কঠিন, এ তো সোজা কথা অতি।
তা ছাড়া মানুষ মূঢ় অজ্ঞান, কিসে কার ভালো হয়
লোকে কী বা বোঝে? বোঝেন কেবল মালিক করুণাময়।
ভ্রান্ত মানুষ নিজের দুঃখ বড় বেশি ক'রে দ্যাখে,
বৃহৎ স্বার্থ মহৎ দুঃখ, বোঝে না কোটিতে একে।

পরম-মালিক আর তাঁর যত প্রতিভূর পিছে পিছে
কত দর্শনকরঙ্কবাহী কত বাণী দিল মিছে।
দারা-সুত-প্রেম —অনেকে বলেছে —মায়াময় বুদ্বুদ
জন্মান্তর পাপের ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদ।
জীবন তুচ্ছ, মোহে ভরা আর পাপে ভরা অতিশয় —
সকল কথাই লাখোবার শুনে তবু যেন ভুল হয়।
তবু দারা-সুত-পরিজন নিয়ে জীবন শিকড় গাড়ে,
সে শিকড় যদি উপড়ায়, লোকে শাপ দেয় বিধাতারে।
সব ত্রুটি আর সব পাপ নিয়ে তবু এ-জীবন প্রিয়,
ধর্ম-মোক্ষ সকলের চেয়ে মরচোখে রমণীয়।

সে-জীবন আজ খসে ঝরে পড়ে শুকনো পাতার মতো,
সে-শিকড় আজ বিষাক্ত ঝড়ে বিচ্যুত, বিক্ষত।
জানি বটে তাতে উদাসী ধরার হবে না বিশেষ ক্ষতি,
নতুন শিকড়ে দেখা দেবে ফের আগামী বনস্পতি।

শাখায় শাখায় রুচি কিশলয়ে রূপ নেবে মধুমাস,
কোথায় হারাবে বিচ্যুত যত প্রাণের দীর্ঘশ্বাস !
তবুও নতুন দিনের নবীন বসন্ত আগমনে,
লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনাশ থাকে যেন কিছু মনে।
আগামী দিনের সুখী কবি যদি কীর্তি-সৌধ গড়ে,
ভিত্তিতে তার অনেক করোটি, রাখে যেন মনে ক'রে ॥

পনেরোই আগস্ট

সহস্র দিনেরই মতো রৌদ্র-ছায়াময়,
তবু সহস্রের মাঝে এই দিন বড় মনে হয়।

এ-দিন আসে না শুধু আকাশে মাটিতে,
ফুলে-ফলে-নদীজলে সোনার লেখন এঁকে দিতে।
আসে না সে অলিন্দে চত্বরে
ধুলায় মলিন খেলাঘরে
আয়ুর ভগ্নাংশ কেড়ে নিতে,
জলের লেখার মত এই দিন মোছে না চকিতে।

প্রহরের ছিদ্রপথে এই দিন হয় না নিঃশেষ,
আশার দিগন্ত পানে এ দিন উড্ডীন নিরুদ্দেশ
জ্যোতির্ময় লক্ষ্যের সন্ধানে।
দৌর্বল্যের কৃষ্ণমেঘে এই দিন দিব্য বাণ হানে।
চেতনা জাগ্রত হয়, সম্মুখের শোনে সে আহ্বান,
এই দিনে জীবনের সূর্যোদয়ে রাত্রি অবসান।

আমরা কি মৃত্যুশীল ? ক্ষীণপ্রাণ, নশ্বর, ক্ষণিক ?
সংকীর্ণ কি নরজন্ম ? হীনযুক্তি এ-মিথ্যারে ধিক্।

মানুষের আশা-স্বপ্ন-কল্পনার কোথা মৃত্যু আছে?
সন্ততির পারম্পর্যে অনশ্বর মানবাত্মা বাঁচে।
যুগ হতে যুগান্তরে খুঁজি মোরা মহার্ঘ জীবন,
নতুনের আবির্ভাবে মুছে ফেলি মৃত্যুর স্মরণ।
চিরজীবী আমরা যে, তাই,
একটি দিনের মাঝে লক্ষ দীপ্ত দিন খুঁজে পাই।
জানি, মনে জানি,
আমরা হারাই যদি, হারাবে না এ-দিনের বাণী।

তাই,
যতবার জীবনের আশ্রয় হারাই,
ততবার ফিরে দেয় আত্মার প্রত্যয়
সহস্র দিনেরই মতো এই দিন রৌদ্র-ছায়াময়

আগষ্ট ১৯৪৭

অদ্যতনী পদ্য

নেই-রাজ্যের খেই-হারানো গল্প মনে আসে,
এই অকাজের খই-ভাজা এক, কাজ কী এ-বিলাসে
কল্পনাহীন গল্পে দিয়ে অল্প কিছু নীতি,
লিখতে যদি শিখতে পারি ঠিক তাহলে জিতি।

মন-ভোলানো খেলনা নিয়ে না-হক্ দোকানদারি,
সূক্ষ্মকাজের মূর্খতাতে দুঃখ বাড়ে ভারি।
খদ্দেরে চায় হদ্দ মোটা, সিদ্ধি নাকি তাতে,
ধুম্সো কাজের গুম্ফ ধরে আবাল-বুড়ো মাতে।

তত্রোপরি ক্ষত্রতেজে আমরা আধামরা,
জম্বুদ্বীপে সম্বলই আজ দমভরা গড়গড়া।
রাজ্য এবং পৃথ্বীভাগের ঝক্‌মকে সব ছুরি
কখন নামে ডাহিন-বামে, ভয়েই জুজুবুড়ি।

এমনিতরো ক্ষুদ্র বড় লক্ষ ঝামেলাতে
কল্পনা সে অল্প কিছু গল্প-গাথা গাঁথে,
সেই মালাটা লুকিয়ে রাখি, কঁকিয়ে কেঁদে বলি,
'আমার ঘরে কিচ্ছুটি নেই, শূন্য আমার থলি।'

১৯৫০

রাজা

জরি আর পুঁতি গাঁথা জমকালো চোগা-চাপকানে
জাঁদরেল চেহারায় পার্ট করে যাত্রার রাজা ;
উষ্ণীষ-আভরণ সবি আছে আয়োজন যা-যা,
রাজসিক হাবভাব, রাজকীয় চাল সবি জানে।
ভোর হলে এই সাজ ফিরে যাবে ভাড়াব দোকানে,
ঘরে আছে হেঁটো ধুতি, কড়া সাজা হু'ছিলিম গাঁজা,
হুকুমের জরু আছে, আছে তাড়ি আব তেলেভাজা,—
আরেক রাজার পার্ট্‌— ভাষাটা তফাৎ, একই মানে।

কিছু যেতে বীররসে, কিছু কিছু করুণ রসের
বিগলিত অভিনয়ে আসর-বাসর করে মাত,
জীবনের পালাগানে মেডেল-ইনাম নেয় জিতে,
কখনো নিজেরে ঢাকে নেশা দিয়ে, কখনো জরিতে,
যত মিছে অভিনয় তত তার পাবার বরাত,
কেননা সে জেনে গেছে সিধে পথ দেশের-দশের ॥

১৯৪৭

ছাগল

গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞা যেন বিচ্ছুরিত দাড়ির আভাসে,
শৃঙ্গ দেখে শঙ্কা হয় তেড়ে বুঝি ঢুঁ মারে কখন,
উদাসীন দৃষ্টি, কিন্তু তৃণশষ্পে লক্ষ্য বিলক্ষণ,
যাহা পায় তাহা খায় দ্বিধাহীন নির্বিচার গ্রাসে।
নধর মাংসল দেহ, তবু কিন্তু খুঁটি ছেঁড়ে না সে,
সঞ্চয়ের মূল্য জানে, ফল পায় চর্বিত-চর্বণ।
ধারে না রুচির ধার, নির্বিকল্প অনুদ্বিগ্ন মন,
তত্ত্ববেত্তা দার্শনিক, বিশ্বরূপ দেখে কচি ঘাসে।

অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা, ভুমো ভুমো কিংবা মিহি কিমা,
স্বাস্থ্য আর কান্তি দানে সবি ধন্য সভ্যতার হিতে।
সর্বদেশে-কালে প্রিয়, হোক পক্ব যে-কোনো রীতিতে,
ধর্মে-কর্মে পালে-পর্বে স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় মহিমা।
বলিবাদ্যে কীর্তি ঘোষে নিজ চর্মে গড়া জয়ঢাক—
তবুও কী সহ্যশীল দণ্ডাহত শ্যামল পোশাক॥

১৯৪৭

ফানুস

ফানুসেরো দিন আছে উঁচু থেকে ওঠে সে উঁচুতে,
নিচের লোকেরা ভাবে সে-ও বুঝি তারারি সামিল।
গরম বাতাসে ফেঁপে মহাশূন্যে করে কিলবিল,
অহংকারে ডগমগ, —কার সাধ্য পারে তারে ছুঁতে?
ফানুসেরো দিন আছে, চুপসানো যদিও শুরুতে —
পেটে তাপ পেলে হয় চাঁদখেকো যেন তিমিঙ্গিল।
রঙিন পোশাকে করে মোমের আলোয় ঝিলমিল,
যোজন-যোজন উড়ে চলে যায় বাতাসের ফুঁতে।

অতি-শস্তা, শিশুতোষ্য, শূন্যগর্ভ রঙিন কাগজ
দশচক্রে ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের চক্ষে দেয় ধোঁয়া,
গম্ভীর মন্থর চালে অন্তরীক্ষে চলে ধূম্রধ্বজ,
নিম্নবর্তী মন্তব্যের বিন্দুমাত্র করে না পরোয়া।
যতক্ষণ ঊর্ধ্বচারী ততক্ষণ সে-ও তো দিগ্‌গজ,
সুদূরে বিহার তার একমাত্র এ-টুকু বাঁচোয়া॥

১৯৪৭

ভোট

নাতিহ্রস্বদীর্ঘস্থূল, অনতিশীদোষ্ণ, নাতিস্থির,
গুণে আর পরিসরে এবম্বিধ চৌকস মগজে
জনতা-নায়িকা সদা প্রাণমন সমর্পিয়া ভজে ;
সর্বদা গলায় দড়ি পৃথিবীতে অতীব বুদ্ধির।
মধ্যম অধম এই দুই পাটে গড়া যাঁতাটির
পেষণে উত্তম মাথা ডাল হয়ে সুধারসে মজে,
জনতা নামিনী বামা পেষে তারে জরুরি গরজে
নেতারূপী নায়কের অবিচ্ছিন্ন উদর পূর্তির।

অতিসভ্য পৃথিবীতে সংক্ষেপে ইহারে কয় ভোট,
অত্যুচ্চ মস্তিষ্কগুলি চাঁটা খেয়ে ঢুকে যায় পেটে,
যত উগ্র কণ্ঠ আর যতই দুরন্ত বাহ্বাস্ফোট
জনতার স্বয়ম্বরে মালা পায় ততই নিরেটে।
গড্ডল প্রবাহ যবে মহোল্লাসে হয় এক জোট
গড্ডল-সর্দার সাথে কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী ওঠে এঁটে ?

১৯৫০

প্রেতচরিত

পৃথিবীর অন্ধকার আনাচে কানাচে,
হিজিবিজি চিন্তার বাঁকের কাছে কাছে,
প্রেতের মতন অশরীরী, অসহায় —
মনীষা ও প্রতিভার ভূতুড়ে ছায়ারা মিলে
ভয়ংকর জটলা জমায়।
অসম্ভব কথা সব বলে তারা, দুর্বোধ্য ভাষাতে
করে তারা কিচির-মিচির ;
কল্পনার ভূতিনীরে চুলের মুঠোয় ধরে
নিয়ে এসে খেলাঘর পাতে,
অন্ধকারে অন্তরালে অশরীরী মস্তিষ্কেরা করে মহা ভিড়।

কত কী যে বলে তারা কে বা দেয় কান ?
কিম্ভূত ভাবনা আর উদ্ভট বক্তব্য নিয়ে
এদের অদ্ভুত অভিযান।
দুর্বোধ্য খুশিতে আর বিচিত্র খেয়ালে
অতি সূক্ষ্ম চিন্তার তন্তুর বেড়াজালে
পৃথিবীর আনন্দের সবটুকু ছেঁকে নিতে চায় ;
ভূতে-পাওয়া ডানা মেলে দুর্বার গতিতে ছুটে যায়
সাহিত্যের, শিল্পের ও বিজ্ঞানের মরু-অভিযানে।

বিভ্রান্ত প্রেতের দল, জীবনের জানে নাকো মানে,
একেবারে রাখে না খবর —
কত ধানে কত চাল, কত চালে কতটা কাঁকর।
কল্পনার ভাঙা তাঁতে ভবিষ্যের জামদানি বোনে,
জীবন জড়ায়ে রাখে দুরাশার টানা ও পোড়েনে।

ওদের এ অস্তিত্বের কোনো দাম নেই,
কামধেনু দোয় বটে, দই তার মারে নেপোতেই।
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে যদি বা ক্বচিৎ পিণ্ড মেলে
অগত্যা তৃপ্তিতে সেই অবজ্ঞার উচ্ছিষ্টেরে গেলে
এদিকে ভারিক্কে চাল, অথচ এমনি বেয়াকুব —
চালচুলো নেই কিন্তু শূন্যকুম্ভ দম্ভ আছে খুব।

এই একদল শীর্ণ প্রতিভা ও মনীষার প্রেত
বিশল্যকরণী খুঁজে গন্ধমাদনেরে তুলে
নিতে চায় শিকড় সমেত।
তুনিয়ার বুকে-বেঁধা শক্তিশেল ধ'রে মারে টান,
উপবাসে জীর্ণকায়, মনে ভাবে কত না জোয়ান।
বড় বড় কাণ্ড করা শখ্ —
পৃথিবীর চিন্তা বয়, এমনি নিরেট আহাম্মক।
যদিও মেলে না ভিখ্ তবু এরা এমনি বাতুল
নিজেদের কৃতিত্বের বাহবাতে নিজেরা মশ্গুল।

হাজার কি লক্ষ বছরের ইতিহাস ধরে এরা
— অলৌকিক, অবাঞ্ছিত, অনিকেত এ-সব প্রেতেরা .
চেপে আছে সিন্দবাদ-পৃথিবীর ঘাড়ে,
ইঁতুরের মতো এরা সিঁদ কাটে এ-বিশ্বের চিন্তার ভাঁড়ারে
সমাজের কানে কানে বুদ্ধিনাশা পরামর্শ জপে,
জীবনের মানে লেখে অর্থহীন নতুন হরপে।
উদ্ভট কল্পনা দিয়ে জাগায় বিপ্লব —
সুখে ও শান্তিতে থাকা এদের জ্বালায় অসম্ভব।

এই সব প্রেতদের আস্তানা ও অস্তিত্ব এড়িয়ে
অধিকাংশ লোক থাকে মনের দুয়ারে খিল দিয়ে।
চোখ কান বন্ধ ক'রে অধিকাংশ বুদ্ধিমান বীর
পরিবার-শ্রাব্য স্বরে হত্যা করে রাজা ও উজীর।
কিছু সংখ্যা অতি-বুদ্ধিমান
অলৌকিক পুণ্যলোভে জুতো মেরে করে গরুদান।
পিণ্ড-লোভী কোনো প্রেত এনাদের বদান্যতা ফলে
প্রেতাত্মিক সারাংশকে বলি দিয়ে পূর্বজন্ম ভোলে।
নবজন্মে ধন্য হয়ে বাঁধে তারা হুঁশিয়ার বাসা,
কংকালে গজায় ভুঁড়ি খাসা।

তবুও এ জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে
প্রতিভা ও মনীষার মুক্তিহীন প্রেতদল ঘোরে।
সর্বক্ষেত্রে বিতাড়িত, নিত্য উপবাসী,
নরর্ষভদের দ্বারে প্রসাদ-প্রত্যাশী।
কখনো শেখেনা ঠেকে, অনাসৃষ্টি ধারণার
বিষবৃক্ষ বীজ বুনে যায়,
আয়েশের বীণা ঘিরে অতৃপ্তির ছেঁড়া তার কেবলি জড়ায়
স্রষ্টার সমান হতে দুরাকাঙ্ক্ষা ভারি,
স্বর্গ-রাজ-তক্ত নিয়ে শূন্য মাঝে করে কাড়াকাড়ি।
তবুও তো বৃষস্কন্ধগণ
অনুকম্পাভরে নিত্য সহ্য করে হেন আচরণ।

কেবল যখন
পৃথিবী ঘুমন্ত, স্তব্ধ শূন্য বাট, সৈকত নির্জন,
আকাশের ঢাকনার অন্তরাল থেকে কোনো রসিক নাগরে
তারার ঝাঁঝরা পথে রঙ নিয়ে হোলি খেলা করে,

তখন উদার মৌন গ্লানিহীন আকাশের তলে
মনীষা ও প্রতিভার প্রেতগুলি জোটে দলে দলে।
তখন ওরাও নাকি নিমন্ত্রণ পায়
মানুষের যৌবরাজ্য-অভিষেকে জগৎ সভায়।
ভূয়োদর্শী বুদ্ধিমান ভাগ্যের বিধাতাগণ জানে
এ কথার সমর্থন নেই কোনো শাস্ত্রে ও পুরাণে ॥

১৯৪৯

জানালা

সমস্ত পৃথিবী নয়, সমস্ত আকাশ নয়,
নয় আদিগন্ত মাঠ, সিন্ধু-গিরি-মালা,
হীনপ্রভ চোখে শুধু একখণ্ড বিশ্বরূপ —
কাঠের সীমানা আঁটা একটি জানালা।

সব দেখা ঢেকে যায় চারিধারে নিরেট দেয়ালে,
উৎসুক নয়ন তবু মলিন সন্ধানী শিখা জ্বালে।
আকাশের খণ্ড নীল, গুটিকয় তারা আর ফুল,
কভু বা ঝড়ের বেগে গাছে গাছে শাখারা আকুল।
মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়া কখনো বা একঝাঁক পাখি,
বিশ্বের অনন্তরূপ কিছু আসে, কিছু দেয় ফাঁকি।
ছোট কুঠুরিতে আজ একটি জানালা শুধু আছে,
তবু, হে সুন্দর ধরা, তুমি আছ ইন্দ্রিয়ের কাছে।

নয়নে নিবন্ত আলো, ধীরে ধীরে মেঘ জমে কালো,
কোথা সে সোনালি রৌদ্র প্লাবনের মতন জোরালো ?

জানালা

আমার স্তুতির সব প্রয়োইজন ফুরাল তোমার ?
নিঃশেষে নিয়েছ সবি ? দিতে পারি কিছু নাই আর ?
তবু আজো খোলা আছে একটি জানালা —
আকাঙ্ক্ষার বাসনার লোভের অতৃপ্ত এক জ্বালা।

সকলি ফুরায়, সবি অন্ধকারে হয় অপগত —
মনের ঔজ্জ্বল্য আর বিশ্বের দাক্ষিণ্য-কণা যত।
শুধু তৃষ্ণা আরো, আরো বাড়ে,
যতক্ষণ এ-জানালা নিরুদ্ধ না হয় একেবারে।
যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের প্রদীপ শিখায়
ছোট বহ্নি দাবাগ্নির মত বিশ্বগ্রাসী হতে চায়,
ততক্ষণ, হে পৃথিবী, কোনো এক জানালার কাছে,
মনে রেখো, একজন পুরাতন পরিচিত আছে॥

১৯৫২

চক্রবাল

জীবনের শেষরূপ চিনে যেতে চাই,
সকল মুখোশ খুলে জীবনেরে দেখে যেন যাই।

কখনো বা এ-জীবন উদ্দাম উল্লাসে
সমস্ত প্রাণের ভূমি ব্যাপ্ত ক'রে বন্যা-সম আসে।
কখনো বা নিভৃত প্রহর
স্মিত অনুরাগে হয় মধুর শাশ্বত অবিস্মর।
আজ দেখি ভ্রূকুঞ্চিত কুটিল আননে
বহুরূপী এ-জীবন অরাতির বেশে আসে রণে।
এমনি সে বিচিত্র অজ্ঞাত,
কভু মনে হয় বুঝি চিনি তারে, তবু চিনি না তো।

জীবনের শেষ কথা ব'লে যেতে চাই,
সকল কথার শেষ কথাটুকু খুঁজে যেন পাই।

যতই কথার তারা মনের আকাশ ভ'রে জ্বালি,
সবি কোথা খসে পড়ে, রেখে যায় নির্বাণের কালি।
যত কথা গাঁথি মালা ক'রে,
সকলি শুকায়ে যায় বারবার স্বপ্নশেষ ভোরে।
কত কথা ভেসে যায় বালুচরে ঝরাফুল সম
আজ তারে জীর্ণ দেখি একদা যা ছিল নিরুপম।
এমনি সে অনায়ত্ত কপট চতুর,
কখনো সে কাছে আসে, কখনো বা দুর্লভ সুদূর ॥

১৯৫২

উদ্বাস্তু

এখানে আকাশ আসে না মাটির কাছে,
এখানে কেবল আকাশের দিকে দু'হাত বাড়ানো আছে।
দু'টি হাতে যদি ও-নীল সাগর থেকে
সুদূরের রঙ কোনোমতে পারি চোখে মুখে নিতে মেখে,
তবে মনে হয়, বনরাজিনীল দিগন্ত সীমানায়
আকাশে মাটিতে কী ক'রে মিলেছে, কিছু কিছু জানা যায়।

এখানে রুক্ষ উষর কৃপণ মাঠ,
কাড়াকাড়ি ক'রে যারা বেশি নেয়, তাদেরি রাজ্যপাট।
এ-মাটির রঙে গেরুয়া ছোপালে ভিক্ষা ভাগ্যলিপি,
যতই উঁচুতে উঠি, বড় জোর সেটা বল্মীক ঢিপি।
দূরে যেতে গেলে পিছে গাঁটছড়া-বন্ধন দেয় টান,
বাসর ঘরের অন্ধকূপেই মানুষ ভাগ্যবান।

তবুও আকাশে নীলের জোয়ার এলে
সব সীমান্ত ছাড়িয়ে যাবার কিছু ইঙ্গিত মেলে।
দু'হাত বাড়িয়ে ভাবি,
ওই নীলে যদি হৃদয় ছোপাই পাবো স্বর্গের চাবি।

সারাটা জীবন খুঁজেও মেলে না উপরতলার সিঁড়ি,
আকাশ ছোঁয়ার মত উঁচু নেই কোনো কাঞ্চন-গিরি।
তবুও ঊর্ধ্ব কেবলি উঁচুতে টানে,
ক্ষণবন্যায় মুছে দিতে চায় গৃহস্থালির মানে।
জানি ও-স্বর্গ আসে না মাটির কাছে,
তবুও এখানে আকাশেরে ছুঁতে দু'হাত বাড়ানো আছে

আগস্ট ১৯৫৩

পরিচয়

কোনোখানে অজ্ঞাতের পরিচয় আছে,
হোক সে অনেক দূরে, হোক বা সে হৃদয়ের কাছে

যত কথা, যত সুর, যুক্তিহীন সামান্যের মোহ,
অকারণে ক্ষণে ক্ষণে ভাবনার অসংখ্য বিদ্রোহ,
কেন জানি এক ঠাঁই এসে
বিশ্বাসে নির্ভরে আত্মসমর্পণে শান্তি খোঁজে শেষে।
কোনো এক দুর্জ্ঞেয় কৌশলে
জীবন-প্রদীপে যত তেল কমে, শিখা বেশি জ্বলে।
জীবনের তুলাদণ্ডে পর্বত-প্রমাণ অবিচার
সামান্য স্মৃতির চেয়ে মনে হয় যেন লঘুভার।

জীবনের বৃত্তে ঘুরি বুদ্ধিভ্রষ্ট মূঢ়ের মতন,
বিশ্বের বৈচিত্র্যপরে রহস্যের ঘন আবরণ।
ক্লান্ত পায়ে নিরন্তর খুঁজি বিশ্বময়,
কোনোখানে কোনোদিন জিজ্ঞাসার যদি শেষ হয়।
যদি বা সন্ধান মেলে —কোন্ ইন্দ্রজালে
অসহ দুঃখেও প্রাণ প্রেরণার দাবানল জ্বালে।

জীবন-পরিধি ছোট, বিশ্বজোড়া জিজ্ঞাসার ক্ষুধা,
অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার কতটুকু মিটাবে বসুধা?
তাই সেই দুর্জ্ঞেয়ের পরিচয় খুঁজি —
সকল প্রশ্নের শেষ সমাধান সেথা আছে বুঝি।
সংখ্যাতীত উপপ্লবে হৃদয়ের ঘোচে না প্রত্যয়,
কাছে কি সুদূরে হোক, অজ্ঞাতের আছে পরিচয়॥

১৯৫৩?

সেতু

জ্যোতির্ময় পৃথ্বী আর ক্ষীণশিখা স্তিমিত হৃদয় —
কী কৌশলে উভয়ের সেতুবন্ধ হয়?

কত তুচ্ছ অবান্তর হীন কর্মচক্রে বাঁধা মন,
তারো মাঝে ক্ষণতরে স্পর্শ দেয় শাশ্বত জীবন।
সেই স্পর্শে আপনারে ভুলি মুহূর্তেকে,
প্রাণের প্রদীপ বুঝি সে-মুহূর্তে তারা হতে শেখে।
সেইক্ষণে দৈনন্দিন সব গ্লানি ভুলে
আকাশেরে ছুঁতে যাই বামনের ক্ষুদ্র বাহু তুলে।
আঘাতে বিক্ষত এই নির্লজ্জ হৃদয়
জীবনের মুখোমুখি পুনর্বার অগ্রসর হয়।

সমাপ্তিরও মোহ আছে। বৃথা আয়ু কখনো হতাশে
গভীর বিশ্রাম খোঁজে সংখ্যাতীত বিস্মৃতের পাশে।
তবু যতবার চিত্তে জ্যোতির্ময় আবির্ভাব দেখি,
ততবার প্রশ্ন জাগে, এ-জীবন এত তুচ্ছ সে কি ?
বিশ্ব আর চিত্ত মাঝে কখনো তো সেতুবন্ধ হয়,
যদিও রহস্য তার জানে না হৃদয় !

১৯৫৪ ?

গন্তব্য

এই ঘর থেকে ওই প্রান্তরের পার
চোখের দৃষ্টির পথ এক লহমার।

তবু সে অনেক দূর। কত দীর্ঘ দিন রাত্রি গেলে,
রিক্ত তপ্ত রৌদ্রে-জ্বলা শুষ্ক দিনে, বিবর্ণ বিকেলে,
দেহ মন টেনে টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের কাছে
প্রাপ্তির সম্পূর্ণ তৃপ্তি আছে।

হৃদয়েরে ছুঁয়ে যাওয়া, দূরে সরে যাওয়া প্রেমগুলি -
অসমাপ্ত ছবিটির পাশে রাখা কতগুলো তুলি —
একদিন জাগরণে প্রেরণায় কেঁপে
ছবিটি সম্পূর্ণ ক'রে দেবে জানি রঙের প্রলেপে।
যা আজ খণ্ডিত ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত ঈপ্সিত বহুদূর,
কোনোদিন তাই হবে পূর্ণতার তৃপ্তি ভরপূর।

তবুও সম্মুখে আজ প্রসারিত দীর্ঘ রাত্রিদিন
অবিশ্রান্ত প্রতীক্ষার প্রয়াসে মলিন।

দৃষ্টি দিয়ে মর্ম মাঝে মুহূর্তেই যারে ছোঁয়া যায়,
তাহারে সম্পূর্ণ পেতে যেতে হবে দিগন্ত সীমায়।
যা আছে অন্তরে অন্তরালে
তার আবির্ভাব শুধু জীবনের রজনী পোহালে।

চন্দ্রের অর্ধেক আজো রয়ে গেল দূর দুর্নিরিখে,
পাঠাল না আলো এই পৃথিবীর দিকে।
অর্ধেক প্রাপ্তির সেই অন্ধকার অতিক্রম ক'রে,
আহত বিক্ষত পায়ে প্রান্তরের সীমান্তের পরে,
কোনোখানে কোনোদিন নিঃসঙ্গ চেতনা
বাঞ্ছিতেরে খুঁজে পাবে, অমৃতের পাবে এক কণা।

আগস্ট ১৯৫৫

ক্লান্তি

এখানে সরাই কোথা? পাহাড়ের উঁচু পথ কেটে,
ভোর থেকে রাত্রি আর রাত্রি-ভোর অবিশ্রাম হেঁটে,
হয়তো বা স্বর্গের তোরণ দেখা যায়।
অবসন্ন পথিকের এ-কান্তারে বিশ্রাম কোথায়?

শুধু তো বিশ্রাম নয়, চাই খাদ্য-পানীয় প্রচুর,
স্বাদে ঘ্রাণে স্পর্শে প্রেমে ভোগ চায় জন্মলোভাতুর।
নিবিড় দেহের স্পর্শ দেহ চায় শীতে ও নিদাঘে,
কাম লোভ মোহ তৃষ্ণা সকলি উদ্দাম তেজে জাগে।
কে করে স্বাগত এই দরিদ্র পথের কিনারায় —
রুক্ষ রিক্ত শূন্য পথে বিশ্রামের সরাই কোথায়?

অবুঝ বুভুক্ষু দিন একে একে নিঃস্ব হাতে আসে,
শত লক্ষ ভিক্ষা চায় বিলাপে ক্রন্দনে দীর্ঘশ্বাসে।
পশ্চাতের সম্মুখের সংখ্যাতীত ঋণ
দাবাগ্নির মতো করে আকাশের তাম্রাভ মলিন।
বিমুখ জগৎ হাসে বিকৃত বিদ্রূপে,
ভিক্ষাভাণ্ড হাতে দিয়ে আসে তীব্র আকাঙ্ক্ষার রূপে।
স্বর্গের তোরণে বুঝি সে-মুহূর্তে বাজে বীণা-বেণু,
ভোগের পিপাসাপাত্রে পুণ্যের নিষ্ফল স্বর্ণরেণু।

জীবন, হে মহাভাগ, দান নিলে পৃথ্বী সসাগরা,
দক্ষিণার স্বর্ণ চাও আরো ঝুলিভরা?
চণ্ডালও সম্ভোগ চায় শ্মশানের পথে,
তারেও রাজত্ব দিয়ে দূর ক'রে দাও রাজ্য হতে!
শূন্য রিক্ত দগ্ধবাট, এ কান্তারে সরাই কোথায়?
হয়তো অনেক দূরে স্বর্গের তোরণ দেখা যায়॥

১৯৫৫

নববর্ষ

বারবার এই তটে এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসে —
বসন্ত-সন্ধানী যাযাবর।
পৃথিবীর আবর্তন অনুসরণের অবসরে
একদিন এই তটে নামে, এই ধূসর আকাশে
একবার রূপালি ডানায় খেলা করে,
তারপর
আবার অয়ন-চক্রে তাদের পাখায় নেচে ওঠে
পদ্মার উদ্বেল ঢেউ, অন্য তট পানে তারা ছোটে।

বৎসরের আবির্ভাব ! আকাশের উত্তাপের সাথে
মিশে যায় হৃদয়ের আশার উষ্ণতা, —
সেই তাপে বাসনার বিহঙ্গেরা মাতে।
তারপর অন্য কোনো অরণ্যের বসন্ত-বারতা
ডানাগুলি কাঁপায় তাদের থরথর।
হয়তো বা কোনো এক নতুন চরের বুক ছেয়ে
নামে তারা উল্লাসে মুখর
সে-সুদূরে বসন্তের আমন্ত্রণ পেয়ে।

দিনের প্রবাহ-পথে এই একদিন একবার,
পুরাতন শাখাগুলি নব-পল্লবের সমারোহে
আশা আর বাসনার বলাকারে আহ্বান জানায়
হৃদয়ের ক্ষীণতোয়া ভ'রে ওঠে কানায় কানায়
প্রাণের আনন্দ-স্রোতে ;— আর
বায়ুস্রোত ব'হে
স্মরণের মৃদুগন্ধ স্বপ্নঘোর আনে চেতনায়।

দীর্ঘতর হয়ে আসে পশ্চাতের নিষ্ফল প্রান্তর,
সম্মুখে যাত্রার পথ আর কতটুক ?
তবুও যখন বর্ষ আসে
সহস্র প্রত্যাশা-ভরে দুরু দুরু কেঁপে ওঠে বুক,
মোহ রচে সম্মুখে দিগন্ত-পরিসর,
মনের আকাশ ছেয়ে আবার রূপালি ডানা ভাসে ॥

১৯৫৬

আনন্দ

যত দূর চোখ যায় যত দূর মন,
তত দূর আনন্দ করে বিচরণ।
বয়সের গিঁঠ-বাঁধা লম্বা সুতোয়
মনের উড়ানো ঘুড়ি তারা ছোঁয় ছোঁয়।
চোখ ভ'রে দেখা আর মনের দেখাতে
আকাশ পাতাল জুড়ে খেলাঘর পাতে।
কিছু জানা, কিছু পাওয়া, কিছু মনগড়া,
রঙে আর রসে গাঁথা মালা এক ছড়া।
যতটুকু অনুভব, যতখানি আশা,
ততদূর হৃদয়ের মধুর তামাশা।

পৃথিবীর রাজপুরী খোলা চারিধার,
কোনো ঘরে চাবি নেই, মুক্ত দুয়ার।
যেদিকে যেখানে খুশি, যখন তখন
আনন্দদীপ জ্বেলে করি বিচরণ।
কোনোখানে গজমোতি, কোনোখানে হীরে,
কোথাও মানিক জ্বলে নিকষ তিমিরে।
অশ্রুফোয়ারা কোথা —মুক্তোর হার,
কোথাও আঘাতে বাজে প্রাণের সেতার।
যা দেখি, যা মন ভ'রে প্রাণ ভ'রে আসে,
হৃদয় জাগায় সবি নব উল্লাসে।

মেঘে ঢাকা চাঁদ আর নিবে যাওয়া তারা,
বজ্রের হুঙ্কার, শ্রাবণের ধারা,
নিত্য নতুন রূপে সবি থাকে মিলে
আমার আনন্দের আলোর মিছিলে।

যতটুকু পাই আর যা কিছু হারাই
আমার খুশিতে আছে সকলেরি ঠাঁই।
নিকটের দেখা আর স্বপ্ন সুদূর
মনের বাঁশিতে বাজে সবগুলি সুর।
যত দূর আয়ু আর যত বড় প্রাণ
তত বড় জলসায় তত বেশি গান॥

১৯৫৫-৫৬

আশ্বিন

ওই নীল হয় না মলিন,
রৌদ্রের সোনায় নাওয়া মন-ছাওয়া প্রসন্ন আশ্বিন।

ও নীলের স্রোত বেয়ে বর্ষে বর্ষে বার বাব আসে
স্মরণেব স্বর্ণপর্ণ বিহঙ্গেবা মনের আকাশে।
যা-কিছু হারিয়ে গেছে, কোনোদিন এসেছে যা কাছে,
গুটানো ফিতায় যারা আজ শুধু ছায়াচিত্রে আছে,
যত কথা বিবর্ণ মলিন পুরাতন —
নিরাশ্রয়, যাবাবর, আজ করে শূন্যে বিচরণ,
আশ্বিনের নীলাভ হাওয়ায়
আজ তারা পরিচিত সৌরভ মিলায়।

জীবনের সব পাওয়া লজ্জা ভয় গ্লানি দিয়ে মাখা,
শঙ্কিত চকিত ত্রস্ত সব চাওয়া, সব কাছে ডাকা।
শেষতিক্ত তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার পেয়,
জীবনের দিবালোক — ক্ষণপরে অস্তমিত সে-ও।
অগস্ত্যযাত্রার পথে এরা একে একে
গোপনে ভুবন ভ'রে প্রাণের সৌরভ যায় রেখে।

গ্লানিটুকু সাথে নিয়ে, পিছে ফেলে যায়
আনন্দের গুঞ্জরণ অজ্ঞানিতে সারা চেতনায়।
সে আনন্দ, সে সৌরভ ঋতুচক্রে আনে একদিন
অমলিন নীলে-নাওয়া সোনা-ছাওয়া প্রসন্ন আশ্বিন॥

১৯৫৩-৫৪

শরতের মেঘ

একটি দুয়ার খুলে রাখো
তোমার নিভৃত কক্ষে সব দ্বার রুদ্ধ কোরো নাকো।
ওই দ্বারপথে কভু শরৎ-নীলাভা যদি আসে,
কেশভার এলোমেলো হয় যদি সহসা বাতাসে,
তার সাথে মিশে কোনোবার
স্মরণের কণাটিরে প্রবেশের দিয়ো অধিকার।

বিস্মৃতির বন্দিত্বের সোনার শিকলে বাঁধা পাখি,
তোমার ভোরের স্বপ্নে যদি আমি মিশে গিয়ে থাকি —
তবু আজ সে-স্বপ্নেরে শরতের মেঘের মতন
জাগরণে মুহূর্তেক করিবারে দিয়ো বিচরণ।
জানো না কি এ-মেঘের পক্ষপুটে অস্তরাগ মাখা,
গৃহমুখী যূথভ্রষ্ট বিহঙ্গম, শ্রান্ত ক্লান্ত পাখা?

আমার আকাশে কোনো রুদ্ধ দ্বার নাই,
সব দিক মুক্ত হেথা, সহস্র স্মৃতির হেথা ঠাঁই।
তাই, তুমি জানো বা না জানো —
তোমার অস্তিত্বটুকু লক্ষরূপে এখানে ছড়ানো।
সে দুর্বহ অভিশাপ, সে অমৃতময় আশীর্বাদ,
ইন্দ্রিয়ের শত পথে ক্ষণে ক্ষণে পাই তার স্বাদ।

তুমি সুখী জানি,
জীবনের খেলাঘরে অবরুদ্ধ রানি।
আর আমি নিষ্ফল অস্থির,
যতই ফুরায়ে যাই স্মৃতিগুলি তত করে ভিড়।
তবুও কী বিস্ময় অপার,
জানো না যে এ-আকাশে তোমারি বিস্তীর্ণ অধিকার

নির্বাণ

এখন আকাশ-মাটি ফুল ফল মানুষের মন
সব মিশে একাকার হয়ে গেল। আমি আর তুমি,
আর দুঃখ সীমাহীন, আর আশা নেশার মতন
সমস্ত কল্পনা-ছাওয়া, স্বর্গ মর্ত আকাশ ও ভূমি
ছেয়ে গেল আলোস্রোতে সূচীভেদ্য আঁধারের মতো।
চোখে আর দৃষ্টি নেই। হৃদয়ের সব আঁকে-বাঁকে,
সব সুখে সব দুঃখে, সমস্ত ভুবনে ওতপ্রোত
সমস্ত অতীতে আর ভবিষ্যতে ছড়ানো চাওয়াকে
একটি নিমেষে যেন মূর্ছায় নিস্তব্ধ ক'রে দিলে।

একেই কি প্রাপ্তি বলে? মুহূর্তের ধ্যানমগ্ন মনে
ত্রিলোক ত্রিকাল এসে হ'ল আত্মহারা? এ-নিখিলে
সতীর দেহের মতো ছড়ানো তোমাকে সচেতনে
পরিপূর্ণরূপে কি পেলাম?
কত হ্রস্ব এই স্বাদ!
কত লঘু এই ছোঁয়া। তবু সব চেয়ে তুমি জানো
আকাশ-পাতাল-জোড়া এ-বিশ্বের শূন্যতা অগাধ,
জানো কত বড় এই পাওয়া, কত বিশাল হারানো।

প্রথম বর্ষার মতো এই ছোট মুহূর্তের পরে
অফুরন্ত বেদনার ধারাস্রোতে হবে পুণ্যস্নান
আরো বহুদিন জানি। তবু পলে দণ্ডে বা প্রহরে
প্রচ্ছন্ন হবে না এই নিমেষের পরম নির্বাণ ॥
সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

মেঘচ্ছায়া

শরৎ মেঘের স্নিগ্ধ ছায়াগুলি চলে যায় উড়ে'
আমার বিশ্রাম হতে, আমার পৃথিবী থেকে দূরে,
শীতল সান্ত্বনাটুকু আয়ুস্রোতে লুপ্ত হয়ে যায়
অজ্ঞাত সুদূর কোন্ অন্ধ তমিস্রায়।

মনের সঞ্চয় নিয়ে বিলাসের যত অবসর
ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়, চিন্তা হয় গোধূলি-ধূসর।
আচ্ছাদনহীন চিত্তে তপ্ত স্পর্শ পাই,
দগ্ধ দিবসের গ্লানি সব শান্তি ক'রে দেয় ছাই।

এর পর ঋতুচক্রে ভবিতব্য হিমেল জড়তা,
নিরুদ্যম মন হবে জীর্ণ শুষ্ক স্রোতস্বিনী যথা,
প্রাণময় বিশ্ব হতে কী নিষ্ঠুর হবে নির্বাসন,
চিত্তের বিলাসহীন নিরুল্লাস জীবন্ত মরণ।
সেই মৃত্যু কাছে আসে মেঘগুলি যতদূরে চলে
আমারে বঞ্চিত ক'রে শীতল চঞ্চল ছায়াতলে ॥
১৯৫৭ ?

মৃত্যু

প্রচণ্ড লেলিহ কোনো বহ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গের কণা
অকস্মাৎ দীপ্ত বেগে অস্তিত্বের একেবারে কাছে
ছুটে এলো। হৃদয়েরে স্পর্শ ক'রে, ঘুমন্ত চেতনা
উত্তাপে জাগ্রত ক'রে, অন্তরের আনাচে কানাচে

দীপ্তি দিয়ে, তৃপ্তি দিয়ে প্রীতির তৃষ্ণারে, সে সহসা
অন্ধকারে মিশে গেল নিরাকৃতি ছায়ার মতন।
যেন কোন্ ঘূর্ণমান্ জ্বলন্ত সূর্যের থেকে খসা
সদ্যোজাত কোনো এক বহ্নিময় গ্রহ ; কিছুক্ষণ
শস্যে ফুলে ফলে আর অজস্র পার্থিব সমারোহে
দৈনন্দিন আবর্তনে ছিল অন্য পৃথিবীর মতো।
তারো বক্ষ জুড়ে ছিল নরনারীশিশু জৈব মোহে
একান্তে জড়ায়ে পরস্পরে। সে-আকাশে লক্ষশত
আশা আর স্বপ্ন ছিল বর্ণময়। আজ অকস্মাৎ
তমসার প্রলয়-প্লাবনে সেই ফুল ফল সেই প্রাণ,
সেই বর্ণচ্ছটা আব তাপতৃষ্ণা, সেই দিনরাত
আর তার সাথে মেঘ-তারা-ফুল-আশা-ভাষা-গান
সব কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে।

এই হোত ভাল, যদি
ওই আলো, ওই প্রীতি, নিশ্ছিদ্র লুপ্তিতে চিরতরে
চেতনা-সীমান্ত পাবে চলে যেত। যদি নিরবধি
সে লুপ্ত গ্রহের তাপ প্রাণের নদীর কূল ভ'রে
স্মৃতির উচ্ছ্বাস নিয়ে আজো নিত্য বয়ে নাহি যেত।
তবু কী বিস্ময়! আজ লুপ্তিতেও অবলুপ্ত নয়
সে-স্ফুলিঙ্গ চেতনার বিশ্বরূপ হ'তে। আজো সে তো
নিজে নিবে গিয়ে. তারি আলো হ'তে জ্বলা জ্যোতির্ময়
শিখাগুলি যায়নি নিবিয়ে। স্মরণের দাহ রেখে
নিয়ে চলে গিয়েছে সে সান্নিধ্যের উষ্ণতার স্বাদ।
মনের আকাশ ভ'রে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া এঁকে
বিনিঃশেষে মুছে নিয়ে চলে গেছে আলোর প্রসাদ!

সকলি নশ্বর যদি, সত্য যদি অনুভূতিময়
চেতনা কেবল, তবু সত্য হোক মানবের ভাষা
স্মৃতির ছোঁয়ায় ; আর জীবনের যদি লুপ্তি হয়,
তবুও সে রেখে যাক কাব্যে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা ॥

১৯৫৫

প্রশ্ন

আয়ু কি জীবন ? ম্লান বৈকালের বিষণ্ণ বাতাসে
বারবার স্বস্তিহীন এ-জিজ্ঞাসা-আসে।

যত ভালো-লাগা আর যত প্রেম সব জড়ো ক'রে
যেন লঘু একগাছি হার,
দীর্ঘ কর্মময়চক্রে অধিকাংশ উপলে প্রস্তরে
বোঝা গুরুভার।
তবুও সামান্য নিয়ে বেঁচে থাকা বড় মনে হয়,
জানি না এ-তুচ্ছতায় জীবনের কোন্ পরিচয়।

আজ ভাবি জীবনেরে হয়তো বা দেখেছি কখনো,
হয়তো বা কোনো লুপ্ত মুহূর্তে তা রয়েছে লুকোনো।
বাসনার কামনার আকাঙ্ক্ষার একান্ত আগ্রহ
যে-প্রেমেরে একদিন ব্যাপ্ত ক'রে ছিল অহরহ,
সেখানে কি দেখেছি জীবন ?
দুঃসহ দুর্বহ সুখে ভরা সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ।

অথবা কি কোনোদিন অহেতুক আত্মবিস্মৃতিতে
শুধু ভালো-লাগা মাঝে জীবন এসেছে ছোঁয়া দিতে ?
আনন্দে সন্তোষে সুখে অশ্রুতে, কোথায়
জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় ?

কর্মে জয়ে সংগ্রামে, না আলস্য-বিলাসে,
ব্যাকুল অধীর মনে কখন্ সে লঘু পায়ে আসে ?

বৈকালের অস্পষ্ট ছায়ায়
নিরুত্তর প্রশ্ন জাগে —আয়ুতে কি জীবন ফুরায় ?

১৯৫৫

অগ্রদানী

সহস্র দৃষ্টির কণা লক্ষ্যহীন জোনাকির মতো
আশে পাশে ভেসে যায়, তবু রাত্রি তমিস্র নির্জন।
অজ্ঞাত আশ্রয় খুঁজে ক্লান্ত পায়ে চলি সর্বক্ষণ
ধরার অরণ্যপথে ভ্রান্তদিশা কণ্টকে বিক্ষত।
নিরুত্তাপ প্রেতপ্রায় অকরুণ ছায়া লক্ষ শত
হিংস্রতায় ঘিরে রয়, আঘাতের গড়ে আবরণ,
অবুঝ হৃদয় কাঁদে সে আঘাতে, তবুও জীবন
নির্লজ্জ আশায় অন্ধ, —সম্মুখে সে চলে অবিরত।

শুধু উদাসীন নয়, ঈর্ষাময় নির্দয় যদিও,
তথাপি আমার আয়ু আব মোর মন দিয়ে গড়া
আমারি পৃথিবী এ যে ! অসার্থক যদিও এ প্রাণ,
তবুও আমার চোখে সর্বাধিক রূপময় প্রিয়
আমার এ-জীবনের প্রীতি খেদ ভুলের পসরা,
তবু ভালোবাসি এই পৃথিবীর বাঁ হাতের দান ॥

১৯৫৭ ?

পরমাণু

আমার মনের চেয়ে কত পুরাতন ?
আমার আকাঙ্ক্ষা চেয়ে আরো কত বড় ত্রিভুবন ?

বিবর্ণ পুঁথির পরে ক্ষীণচোখে রাত্রিদিন ঝুঁকে,
লিপিবদ্ধ সময়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশ্চাতে সম্মুখে
ঘুরে ঘুরে দেখি ইতস্তত,
সবখানে এ-হৃদয় ছেয়ে আছে আকাশের মতো।
অনাগত কালের অদৃশ্য অন্তরালে
আমার বাসনাবহ্নি অন্তরে অন্তরে শিখা জ্বালে।

ক্ষুদ্র এই বিশ্বজোড়া মন
জীবনের দান হতে কণামাত্র করে না বর্জন।
প্রেমে দুঃখে কামনায়, কর্মে আর আলস্যবিলাসে,
হীনতায় রিক্ততায় ঐশ্বর্যে আনন্দে সুখে ত্রাসে,
নিজেরে সে মিশে দেয় পরমাণু প্রায় ;
দিক হতে দিগন্তরে উড়ে যায় ঘূর্ণিত হাওয়ায়।
যদি কিছু ভালোবাসা পেয়ে থাকি, দিতে পেরে থাকি,
আগত কি অনাগত সব প্রেমে মেশা নেই তা কি ?
যা কিছু মানুষ চায়, যা কিছু চেয়েছে কোনোদিন,
আমার সকল চাওয়া তার মাঝে ওতপ্রোত লীন।

ছোট এই জীবনেরে ঘিরে আছে কত সমারোহ,
ছোট যদি এ-হৃদয় বিশ্বজোড়া তবু তার মোহ।
যতই অতীতে চাই, যত ভবিষ্যতে,
আমার চেতনাটুকু ভেসে রয় সময়ের স্রোতে।
জগতের কামনার শেষ যদি না থাকে কোথাও,
আমার আকাঙ্ক্ষাটুকু, সেও জানি অনন্তে উধাও॥

পদধ্বনি

ঘোরানো সিঁড়ির যেন ধাপে ধাপে ক্রমে নেমে আসে
অস্পষ্ট অনুচ্চ এক পদধ্বনি নিশ্চিত মন্থর।
সঙ্কুচিত হয়ে আসে ব্যবধান প্রত্যেক নিঃশ্বাসে,
অজ্ঞাত অস্তিত্ব কোনো প্রতিক্ষণে হয় অগ্রসর।
অযাচিত আগন্তুক, অনিবার্য অদৃশ্য অতিথি,
আসে না সে সূর্যসম অকস্মাৎ জ্যোতির বিকাশে,
খোঁজে না সে অভ্যর্থনা, জানে না সে বন্ধুতার রীতি,
অচিন্ত্য অদ্ভুত বার্তা বয়ে নিয়ে ক্রমশ সে আসে।

এখনো সময় আছে, এখনো নির্জন অবসর,
শুধু বাকি আছে আর লিখে যাওয়া একখানি চিঠি,
এখানের খুঁটিনাটি ছোট বড় সকল খবর,
মনে-রাখা, ভুলে-যাওয়া, মনে-পড়া কথার প্রতিটি।
ক্রমান্বিত পদধ্বনি যতক্ষণ দুয়ারে না থামে।
ততক্ষণে ঠিকানাটা লিখে দিতে পারি যেন খামে॥

১৯৫৬

মূর্তি

তীক্ষ্ণধার যন্ত্র দিয়ে জীবনের নিষ্ঠুর ভাস্কর
অস্তিত্বের অন্তরঙ্গ খণ্ডগুলি ভেঙে ভেঙে ফেলে।
কাল যা সংলগ্ন ছিল সত্তায়, তা আজ অবহেলে
বিচ্ছিন্ন করে সে।   যত তুচ্ছ হোক, হোক অবান্তর,
তবু যারে জীবনের অংশ জেনে করি সমাদর
সবি খসে প'ড়ে যায়।   ধন্য মানি যার স্পর্শ পেলে,
সেখানেও অস্ত্র হেনে ভাস্কর নির্দয় খেলা খেলে ;
আর্তনাদে ভ'রে ওঠে ক্লিষ্ট প্রাণ আঘাত-জর্জর।

কোনো একদিন এই ভাঙাগড়া হবে অবসান,
পাথরের খণ্ডটুকু সেদিন রবে না নিরাকৃতি,
কৌতূহলী চোখে দেবে না জানি কী মূর্তিরূপে দেখা।
সেদিন জগতে আমি খণ্ডিত আহত ক্লিষ্ট একা,
এ-ক্রন্দনে রবে শুধু আমার সামান্য পরিচিতি,
রুক্ষ সে প্রস্তরখণ্ড কী ছিল তা কে নেবে সন্ধান ?

আগস্ট ১৯৫৫

কোনোখানে

কোনোখানে একদিঘি জল আর ভেজা ভেজা বালি,
ভোরের রোদের ডানা রূপালি-সোনালি।

এখানে খাণ্ডবপ্রস্থে ঘাসে ঘাসে লেগেছে আগুন,
ধোঁয়ায় ধূসর দিক্‌-দিগন্তর, রুদ্ধ সব পথ।
এখানে দারুণ যুদ্ধে সমুদ্যত খড়্গ ধনু তূণ,
সর্বদা জাগ্রত হিংসা, নিত্য শত্রুজয়ের শপথ।
দুর্গের প্রাকারে জাগা কালান্তক সশস্ত্র প্রহরী,
চতুর্দিকে আক্রমণ, টলমল ক্ষুদ্র রাজ্যপাট।
চিন্তায় চক্রান্তে কাটে সন্ধ্যা উষা দিবা বিভাবরী,
পাছে শত্রু ছিদ্র পায়, রুদ্ধ তাই সকল কপাট।
এখানে বিশ্রাম নাই, শঙ্কা অবিশ্বাস চতুর্দিকে,
কূটনীতি কপটতা রিপুধ্বংস চিন্তা অবিরত,
শত্রুব্যূহভেদমন্ত্র প্রতিদিন চলা শুধু শিখে
বিশল্যকরণী খুঁজে বারবার মোছা অস্ত্রক্ষত।

কোনোখানে ছায়া-ছায়া পাখি-ডাকা শীতল বিকাল,
আকাশের কোণে কোণে মেঘে বোনা জাল॥

ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

কী পেলে ? কী পেলে ?

এত বড় নীলাকাশে এক সূর্য জ্বেলে
বলো তুমি কী পেলে ?   কী পেলে ?

যখন ও সূর্য যায় ডুবে,
আমি তো জ্বালাতে পারি উর্ধ্বে অধে উত্তরে ও পূবে
প্রচণ্ড উজ্জ্বল দাবানল।
দ্যাখো নি কি অন্ধরাত্রে আমার কৌশল ?
আমারি ভিতর থেকে একটি নিমেষে
লক্ষ কোটি বহ্নি জ্বেলে বিশ্ব ভস্ম ক'রে দিয়ে শেষে
নূতন তমিস্রা আমি ডেকে ডেকে আনি বারবার।
স্বর্গ মর্ত মুহূর্তেকে দীপ্ত করি, ক্ষণে অন্ধকার।
শূন্যতার থেকে আমি আগুন জ্বেলেছি নিজে নিজে,
আমার ললাট থেকে অকস্মাৎ জ্বলে ওঠে কী যে
আশ্চর্য ভীষণ অগ্নি —জানো না কি কত তার দাহ ?
পম্পাই ভস্মের পরও গলিত লাভার পবিবাহ।

আর তুমি দিনমানে মহাশূন্যে এক সূর্য জ্বেলে
বলো দেখি কী পেলে ?   কী পেলে ?

আষাঢ় ১৩৬৫

ধ্বনি

ঈথরের স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে ভেসে,
উর্ধ্বে বায়ুলোকে উঠে, কিংবা গ্রহান্তরে ঘুরে এসে,
এ-মাটিতে মরুতে বা প্রান্তরে-কান্তারে যাবে ঝ'রে
আজকের সকল কথা।   এ-লগ্নের গুঞ্জনে-মর্মরে

নেমে যাবে নৈঃশব্দ্যের যবনিকা। সারা জীবনের
ধ্বনির সুতোয় গাঁথা হাসি-কান্নাগুলি আকাশের
কৃপণ নিস্তব্ধতায় খসে-পড়া নক্ষত্রের মতো
চূর্ণ হয়ে অন্ধকারে মিশে যাবে — অশ্রুত সতত
পৃথিবীর মানুষের কাছে।
তবু দূর দূরান্তরে,
দেশ থেকে অন্য দেশে, পল্লী আর বন্দরে-শহরে
মানুষের কণ্ঠস্বর ধ'রে নিতে কত জাল পাতা।
করাচি লণ্ডন থেকে নয়াদিল্লি বোম্বাই কলকাতা
ধ্বনির তরঙ্গগুলি ঘুরে ফেরে আকুলিবিকুলি।
সহস্র নিখুঁত কথা অভিনয় হাসি-গানগুলি
ঘরে এসে ধরা দেয়। শুধু যা স্মৃতির প্রান্তে লীন
অনুচ্চ অস্পষ্ট ক্লান্ত, তাই শুধু আর কোনোদিন
যায় না ফিরিয়ে আনা। যার ক্ষীণ দূরাগত রেশে
আকাশে নীলিমা জমে, জীবনের ছোট পরিবেশে
তাদের মেলে না ঠাঁই। চিরকাল ভেসে চলে তারা
শতাব্দের লক্ষাব্দের সীমা ভেঙে, সব অর্থহারা,
বিশ্ব অতিক্রম ক'রে, জীবন ছাড়িয়ে, ইতস্তত,
আশ্রয়বন্ধনচ্যুত কেটে যাওয়া ঘুড়িদের মতো॥

সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

পাথরপুরী

কোন দূর রাজ্য থেকে এসে
রাক্ষসেরা হানা দিলো মানুষের দেশে।
সোনা-রূপো দুই কাঠি দিয়ে
সকল মানুষ তারা রেখে গেছে পাথর বানিয়ে।

রাজসিংহাসনে রাজা নিশ্চল পাথর।
সভাসদ কৃতাঞ্জলিকর
শিলীভূত হয়ে মিছে অনুগ্রহ যাচে।
সাজানো দোকান নিয়ে নিশ্চল দোকানি বসে আছে
চিরকাল খদ্দেরের লোভে।
দাম দিয়ে কে বা তার পণ্য নেবে? সব মূল্য কবে
মরণ-ঠাণ্ডায় জমে' হয়ে গেছে বরফ-কঠিন!
রাজকন্যা — মেঘবর্ণকেশ — সারাদিন
মিথ্যাই দাঁড়িয়ে আছে গবাক্ষে উদাস দৃষ্টি মেলে।
সে-দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র নেই পুরাকেলে
প্রতীক্ষা অথবা আশা। রাজপুত্র আসে কি না আসে
দেখে না সে ; দৃষ্টি তার হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের পাশে
আরেক মানিক হয়ে জুড়ায়েছে জ্বালা।
এত ভিড়! তবু রাজ্য খা-খা করে — নিঃশব্দ নিরালা।

এখনো হয়তো আছে মাঠে চাষী, ডিঙিতে জেলেরা
তারা দেখে অস্ত্রে মোড়া পরিখায় ঘেরা
রাজধানী প্রাসাদের উঁচু চূড়াগুলি।
ভয়ে ভয়ে দূর থেকে বাড়ায়ে অঙ্গুলি
পরস্পর বলাবলি করে —
জীবন্ত মানুষ ছিল একদিন ওখানে শহরে।
সেই যে রাক্ষস এসে কি মন্ত্র পড়েছে,
রাজা-প্রজা সবই আছে, শুধু তারা কেউ নেই বেঁচে॥

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

উচ্চকথক

উচ্চকথক কণ্ঠ তোলেন
উচ্চ হতে উচ্চে,
নেই পরোয়া কেই বা তখন
পড়ছে, কে ঘুমুচ্ছে।
কার বা ব্যামো, পরীক্ষা কার
নেই কিছুতেই বিকার,
বাজের চেয়ে জোর গলা যার
তিনিই লাউড্‌স্পীকার।

সুরকে ইনি অসুর করেন,
মিষ্টি করেন কটু,
ধনঞ্জয়ের মতন ইনি
কর্ণবধে পটু।
রাগ-রাগিণী রাগিয়ে তোলেন
ধমক মারে তারা,
কোলের ছেলে চমকে কাঁদে,
পথিক দিশাহারা।

চিন্তা ইনি দেন তাড়িয়ে,
মনকে মারেন চাঁটি,
প্রমাণ করেন, এই দুনিয়ায়
জোর গলাটাই খাঁটি।
ফিস্‌ফিসানো, গুন্‌গুনানি,
গোপন কথা, আর
কানে কানে কথায় ইনি
দেন চড়া ধিক্কার।

এঁর প্রতাপে সংসারে হয়
মিহি মোটা সমান,
দশের রীতি পালেন ইনি,
রসের প্রীতি কমান।
সূক্ষ্ম করেন রুক্ষ ইনি,
সুতোয় করেন কাছি,
মালা গাঁথা না হোক, ইনি
গলায় দিলে বাঁচি।

ডিসেম্বর ১৯৫৬

সরস্বতী

সরস্বতী কোথায় থাকেন
কেউ তা জানে কি?
হিমালয়ের গহন বনে?
ফুল বাগানে কি?
অন্ধকারে না রোদ্দুরে,
এক ঠাঁয়ে না বেড়ান ঘুরে,
কাব্যেতে না গানের সুরে
সকল খানেই কি?

কেউ কি জানে সরস্বতীর
আসল ঠিকানা?
রূপ কি তাঁহার নদীর মতো?
আলোর শিখা না?

কলম তুলি বাঁশি সেতার
তৃপ্তি বেশি কোনটাতে তাঁর ?
যতই ভাবো এ জিজ্ঞাসার
জবাব অজানা ॥

১৯৫৮

খেয়াল

দু'আঙুলে তুমি তুলে নিয়েছিলে
বনের কুসুমটিরে,
অলস-বিলাসে রেখেছিলে তারে
উদাস ঠোঁটের পর ;
কী খেয়ালে তার পাপড়িগুলিরে
ফেলেছিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে,
সে মোর হৃদয়, সে যে মম অন্তর !

দু' আঙুলে তুমি তুলে নিয়েছিলে
মদের পাত্রখানি,
হেলায়-ফেলায় কী খেয়ালে তারে
ছোঁয়ালে ওষ্ঠাধর,
নিঃশেষে পান করে সে পাত্র
ফেলে দিলে কোথা জানি,
সে মোর আত্মা, সে যে মম অন্তর ॥

সরোজিনী নাইডুর কবিতা থেকে

১৯৫৬

পথিক গায়েন

বাতাসের স্বর যেখানে মোদের পথিক পায়েরে ডাকে,
প্রতিধ্বনিতে মুখর বনে বা শহরের রাস্তায়,
হাতে বাঁশি আর কণ্ঠেতে গান নিয়ে অনুসরি তাকে,
সকল মানুষ বন্ধু মোদের, ঘর সারা দুনিয়ায়।

যত নগরীর গৌরব মুছে গেছে, তাহাদের গান,
যত রমণীর হাস্য লাস্য মরে গেছে, তার স্মৃতি,
কত যুদ্ধের খড়্গ, রাজার মুকুটের অভিমান,
সুখে দুখে মেশা সে-সব সহজ কথাই মোদের গীতি।

কী আশার কথা, কোন্ স্বপ্ন বা আমরা বুন্‌বো তবু,
বাতাস যেখানে ডাকে আমাদের সেখানেই যেতে হবে।
কোনো প্রেম কোনো আনন্দ পিছু টানে না মোদের কভু,
মোদের ভাগ্য ধ্বনিত কেবল বাতাসের হাহারবে॥

সরোজিনী নাইডুর কবিতা থেকে

১৯৫৬

পুরস্কার

প্রান্তরে ও বনে প্রভু এনো ফাগুন মাস,
বাজপাখি আর বকের ডানায় উড়ন্ত উল্লাস,
চিতায় দিয়ো গতির লীলা ঘুঘুকে রঙ, আর
আমায় প্রভু দিয়ো প্রেমের আনন্দ সম্ভার।

ডুবুরিকে দিয়ো প্রভু উর্মি সেঁচা মণি,
বরের চোখের স্বপ্নে এঁকো বধূর আনন্দখানি,
স্বপ্নাতুরের চক্ষে এঁকো যৌবনেরে, আর
আমায় দিয়ো সত্য জানার হর্ষ উপহার।

ধার্মিকেরে দিয়ো প্রভু বিশ্বাসেরি গীতা,
রাজা এবং সৈনিকেরে কর্মে যশস্বিতা,
পরাস্তকে শান্তি দিয়ো, শক্তিমানে আশা,
কণ্ঠে আমার হর্ষে ভরা দিয়ো গানের ভাষা।

সরোজিনী নাইডুর কবিতা থেকে

১৯৫৬

রাত্রি

ঘুমোও বাছা ঘুমোও, তোমার ঘুম আসবে বলে,
পশ্চিমের ঐ আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল আলো ;
আলোর কণা নিবলো সবি, শিশির শুধু ঝলে,
আমার মুখটি শাদা কেবল, আর সকলি কালো।
ছোট্ট খোকা, তোমার চোখে স্বপ্ন নামে, তাই
পথঘাট সব এলিয়ে আছে শান্তিতে নিঃঝুম ;
নদীর জলের আওয়াজ ছাড়া শব্দ কোথাও নাই,
একলা আমি রই জেগে, আর বিশ্বভরা ঘুম।
আস্তে নামে কুয়াশা —সে ডুবায় স্তব্ধ ধরা,
নীলাভ এক দীর্ঘনিশাস মিলায় তমিস্রায় ;
হালকা মৃদু স্নিগ্ধ হাতের আদর যেন ভরা,
শব্দবিহীন শান্তি এসে বিশ্বভুবন ছায়।
আমার গানে ঘুমিয়ে পড়ে আমার খোকনমণি,
একলা সে নয়, গানের দোলায় যেই সে ঘুমে ঢলে,
অমনি দেখি সেই দোলনে সমস্ত ধরণী
গভীর ঘুমের গহীন গাঙে উধাও ভেসে চলে॥

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল-এর কবিতা থেকে

১৯৫৬

নোঙর

পাড়ি দিতে দূর সিন্ধুপারে
নোঙর গিয়েছে প'ড়ে তটের কিনারে।
সারারাত মিছে দাঁড় টানি,
মিছে দাঁড় টানি।

জোয়ারের ঢেউগুলি ফুলে ফুলে ওঠে,
এ-তরীতে মাথা ঠুকে সমুদ্রের দিকে তারা ছোটে।
তারপর ভাঁটার শোষণ
স্রোতের প্রবল প্রাণ করে আহরণ।
জোয়ার-ভাঁটায় বাঁধা এ-তটের কাছে
আমার বাণিজ্য-তরী বাঁধা পড়ে আছে।

যতই না দাঁড় টানি, যতই মাস্তুলে বাঁধি পাল,
নোঙরের কাছি বাঁধা তবু এ-নৌকা চিরকাল।
নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলি সাগরগর্জনে ওঠে কেঁপে,
স্রোতের বিদ্রূপ শুনি প্রতিবার দাঁড়ের নিক্ষেপে।
যতই তারার দিকে চেয়ে করি দিকের নিশানা
ততই বিরামহীন এই দাঁড় টানা।

তরী ভরা পণ্য নিয়ে পাড়ি দিতে সপ্তসিন্ধুপারে,
নোঙর কখন জানি প'ড়ে গেছে তটের কিনারে।
সারারাত তবু দাঁড় টানি,
তবু দাঁড় টানি ॥

রবি-প্রণাম

আলো, দীপ্ত আলো আনো, ছিন্ন করো কৃষ্ণ আচ্ছাদন
দৃষ্টির সম্মুখ হতে, মুক্ত করো আত্মা-প্রাণ-মন
তমসা বিদীর্ণ ক'রে।—এ-প্রার্থনা জাগে নিত্যকাল
বিশ্বমানবের কণ্ঠে। তাই কভু জ্যোতির মশাল
প্রাণের আগুনে জ্বেলে নেমে আসে মাটির ধরায়
কোনো দীপ্ত মানবাত্মা —মেঘাচ্ছন্ন শর্বরীসীমায়
যেন সূর্যোদয়। তার আলো আসে নভোতল ছেয়ে
দেবতার আশীর্বাদরূপে, আর সে-প্রেরণা পেয়ে
জাগে তৃণ, জাগে পৃথ্বী, স্বপ্ন ভেঙে জাগে নির্ঝরিণী ;
ঘুম-ভাঙানিয়া সেই আত্মার ভাস্বর রূপ চিনি।

আমরা দেখেছি তারে নবজাত সুপর্ণের মতো
তমো হতে জ্যোতির্লোকে, মৃত্যু হতে অমৃতে সতত
জীবনেরে নিয়ে যেতে, মানুষেরে জানাতে আহ্বান,
শোনাতে-সম্মুখপথে চিরদিন এগোবার গান।
হতাশার দৈন্যেরে সে ছিন্ন করে, মুক্ত করে ভয়,
নির্জীব প্রসুপ্ত প্রাণে নিয়ে আসে বলিষ্ঠ প্রত্যয়।
গগনে তপন সম, তথাপি সে হৃদয়ের কাছে,
সমুদ্রপর্বত তারে রুধিল না, তবুও সে আছে।
সেই সূর্যপ্রভ দীপ্ত প্রতিভার গাঢ় অনুরাগে
রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে এ-জীবনে নব স্বাদ জাগে।
সব মানুষের সাথে হৃদয়ে হৃদয়ে সেতু বাঁধি,
আলোর প্রলয়-স্রোতে তমিস্রার নিশ্চিহ্ন সমাধি।

এত যে বেসেছি ভালো এই পৃথিবীর ফুল, পাখি,
বিষণ্ণ শ্রাবণ আর ঝঞ্ঝামত্ত উদ্দাম বৈশাখী,

এত যে মাটির মায়া, এমন যে নভোচারী মন,
সবি এক উৎস হতে প্রাণরস করে আহরণ।
যত দূরে, দিগন্তের যত দিকে দু' চোখ ফেরাই
সূর্য তার দীপ্তি হতে কারেও বঞ্চিত করে নাই।
জগতেরে জীবনেরে সে-আলো দিয়েছে সত্য দাম,
যুগান্তের তন্দ্রাহরা জ্যোতির্ময় সূর্যেরে প্রণাম॥

যে-লোকটা

যে-লোকটা বলেছিল, 'এদিকে গেলেই
পাবে ঠিক পথের নিশানা'—
নিজেই সে দেখি পথে পথে ঘুরে মরে
সব পথকানা।
কত গলিঘুঁজি ঘুরে বর্ষায় রোদ্দুরে,
সব দ্বার, সব জানালায় চিহ্ন রেখে,
ভেবেছে সে, একদিন জলে ভিজে
রোদে তেতে পুড়ে
নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেবে
ঘুরে-মরা থেকে।

এখন ঘুমের ক্লান্তি পায়ে তার
শিকলের মতো,
তাপে ও তৃষ্ণায় তার দুটি চোখ
যেন পোড়া মাটি,
এখন সে সারাদিন খুঁজে ফেরে
গলিঘুঁজি যত,
কিছুতে পায় না খুঁজে নিজেরি
ঘরের ঠিকানাটি।

যে-লোকটা বলেছিল,
‘দেখেছি অনেক,
অনেক জেনেছি, জানি, বলে দিই
যার দরকার।’
এখন নিজেই দেখি নিয়েছে সে
ভিখিরির ভেক,
কেবলি শুধায়, ‘জানো, আমি কার ?
আমি কোথাকার ?’

অতন্দ্র

ঘুমন্ত শিবিরদ্বারে ত্রিশূলী প্রহরী অকস্মাৎ
তীব্র কণ্ঠে ডাক দিল ‘জাগো’। মুহূর্তেকে স্বপ্ন টুটে
চোখে চোখে অগ্নি জ্বলে ওঠে ; দুই কিণাঙ্কিত হাত
দৃঢ়তায় মুষ্টি বাঁধে ; জড়তার শয্যা ছেড়ে উঠে
সহস্র শিবির হতে লক্ষ কণ্ঠে আকাশ কাঁপিয়ে
সাড়া জাগে ‘ভারতের আত্মা জেগে আছে, হে বিধাতা’

আহা রাত্রি শান্তিময়! আসে নিদ্রা নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে,
মানুষের চোখ-প্রাণ ধুয়ে মুছে দিতে —যেন মাতা
সন্তানের অন্তরের সব গ্লানি মুছে দিতে চায়।
নিদ্রা তো অপাপ —প্রীতি প্রেম আর বন্ধুতার সুখে
চেতনার অবলুপ্তি। সেই সুপ্তি শ্বাপদের প্রায়
যে-দুর্বৃত্ত কলঙ্কিত করে, নিদ্রিতের মুক্ত বুকে
যে আসে বিঁধতে ছুরি, প্রীতিরে যে করে অপমান,
মনুষ্যত্বে পতিত সে ; হোক বলী হোক ভয়াবহ
হোক সে বিশাল, তবু বড় জোর দস্যুর সমান,
যে-ক্ষত সে করে সে তো বক্ষে নয়, হৃদয়ে দুঃসহ।

বিশ্বাসে সে অস্ত্র হানে, বন্ধুত্বে সে আনে কৃতঘ্নতা,
শান্তিকে সে দগ্ধ করে ধ্বংসের ঘৃণিত অগ্নি জ্বেলে,
মাতা করে পুত্রহীন, গৃহ ভাঙে, মত্ত পশু যথা,
মূর্খতায় চেষ্টা করে মানুষ বানাতে ছাঁচে ফেলে।

এদিকে শিবিরদ্বারে হাঁক দেয় ত্রিশূলী প্রহরী —
'জাগো!' তৎক্ষণাৎ লক্ষ কোটি চোখে অগ্নি জ্বলে ওঠে,
যুগে যুগে দস্যুরূপে হানা দেয় মানুষের অরি
যুগে যুগে ভারতাত্মা সাড়া দেয় বাহুর আস্ফোটে।
সর্বকালে জেগে ওঠে এ-ভারত মিথ্যার আঘাতে,
পূর্ণতেজে বক্ষে বাঁধে দুর্ভেদ্য কবচ, হাতে নেয়
তীক্ষ্ণ খড়্গ ধনুঃশর। মাহেন্দ্র সে যুগের প্রভাতে
'ভারত জাগ্রত আছি' সম্মিলিত কণ্ঠে সাড়া দেয়॥

রাত্রির তপস্যা

মানুষ কি আলো খোঁজে?
না, আলোই মানুষকে খুঁজে বেড়ায়?

অন্ধকার গুহার মধ্যে যোগাসনে বসে ধ্যান করি।
উর্বশী-মেনকা সেখানে আসতে পারে,
কিন্তু সূর্যের আলো আসা অসম্ভব।
কারণ, অন্ধকার গুহায় না বসলে
তপস্যা জমে কই?
আর, তপস্যা না হলে
সিদ্ধিলাভই বা হয় কেমন ক'রে?

আলো তার অসংখ্য বাহু চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে
অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে।
যদি দৈবাৎ ক'টা মানুষকে মুঠোর মধ্যে পায়
তবে তার মহা সৌভাগ্য।
রাক্ষসের মত বিশ্বব্যাপী ব্যাদিত মুখে
সকল মানুষকে সে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে চায়,
গ্রাস ক'রে নিতে চায়,
বিলীন ক'রে দিতে চায়।
কিন্তু তুমি আর আমি —
আমরা জানি যে,
আলোর সেই সত্তালোপকারী কবলে
আমরা আজও ধরা দিই নি,
ধরা দিই নি॥

পৃথিবী

আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনেছি,
এই পৃথিবী আমার।

এই পৃথিবীর মাটি জল আর পাথর,
হিংসা আর ভালবাসা,
দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর ভয়,
সব সমেত এই পৃথিবীর জন্য
আমি যথেষ্ট দাম দিয়েছি,
খুব চড়া দাম দিয়েছি,
কত বড় দাম দিয়েছি
তা তোমরা জান না।

পৃথিবী আমার ক্রীতদাসী,
পৃথিবী আমার ভোগসঙ্গিনী,
পৃথিবী আমার নিত্যকিংকরী,
একে নিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি

কারণ, পৃথিবীকে আমি কিনেছি,
আমি অনেক দাম দিয়ে কিনেছি,
কত বেশি দাম দিয়েছি,
কত বড় দাম দিয়েছি
তা তোমরা জান না ॥

চৌকাঠ

এই চৌকাঠ পেরুলেই ঘন অরণ্য
শ্বাপদকুলের শরণ্য।

বীণাকণ্ঠিনী, কণ্ঠ তোমার কোন্ পর্দায় ওঠে ?
ঘোর অরণ্যগর্জন তাতে চাপা পড়ে না তো মোটে।
ওখানে ভীষণ দংষ্ট্রার সারি অহরহ প্রস্তুত,
ক্ষণেক ভোলাবে তাদের এমন নেশা জানো অদ্ভুত ?
তোমার প্রণয় এমনি হাল্‌কা, থামে না বুকের কাঁপা,
অত উজ্জ্বল আলো কই যাতে তমিস্রা পড়ে চাপা ?
যত চুম্বন আলিঙ্গনের মোহজাল পাতো কন্দে,
জানি চৌকাঠ পেরুলেই ছিঁড়ে শতধা করবে বন্ধে।

দণ্ডের নেশা পলেই ফতুর এমনি তোমার জাদু !
আমার রক্তে যে-স্বাদ, তোমার প্রেম কই তত স্বাদু ?
দিগন্ত-ছোঁয়া কান্তার-মাঝে বিলাস-লীলার হর্ম্য,
সমুখে ত্রিশূল উদ্যত, বুকে প্রণয়লিপির বর্ম !

প্রেমাশ্রু-সাথে মদের মেশালে নেশা জমে বটে বেশ,
তবু সে-নেশার বহ্নিশিখাটি এক ফুঁয়ে নিঃশেষ!
যতই মায়ার নীলাঞ্জনের কালো চোখে ডাকো কণ্ঠে,
জানি চৌকাঠ পেরুলেই ছিঁড়ে শতধা করবে বন্ধে॥

সেপ্টেম্বর ১৯৬১

বাজপাখি

হঠাৎ কোন্ মহাশূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
কঠিন অব্যর্থ নৃশংস ঠোঁটে
অসহায় দুর্বল পাখির ছানাটাকে
মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাজপাখিটা।
তারপর ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে উঠে
মেঘরাজ্যে দৃষ্টির সীমানায় ভেসে গেল,
যেন একটা কালো চাঁদের ফালি।

ছোট পাখিটার উষ্ণরক্ত ওর রক্তে মিশে গেল,
তার প্রাণ ওর ডানাদুটিতে দিল বলিষ্ঠ গতি,
ওর নখর আরো একটু তীক্ষ্ণ হল।
আবার ও পৃথিবীতে নেমে আসবে
তাজা রক্তের পিপাসায়।

কী সুন্দর বাজপাখিটা ভেসে যাচ্ছে ছাখো!
ওর দেহে পৃথিবীর উষ্ণ রক্ত
ওর মাথায় স্বর্গের আশীর্বাদ,
ওর ডানায় বায়ুলোকের অনাহত বীণা বাজছে॥

সেপ্টেম্বর ১৯৬২

পল্বল

আমিও তো আকাশ ছিলাম —
নীলোজ্জ্বল স্বচ্ছ মুক্ত কাকলী-মুখর অবিরাম।
আমিও তো কোনো একদিন
বিস্তারে ঔদার্যে হর্ষে দীপ্ত অমলিন
পৃথিবী আবৃত ক'রে রেখেছি এ-হৃদয়ের তলে।
তারপর অকস্মাৎ কী খেয়ালে, কোন্ কৌতূহলে,
মেঘে মেঘে ঢেকে দিয়ে পরিপূর্ণ বক্ষের প্রসার
ডেকে এনে কেশঘন নিবিড় আঁধার
একটি তারাকে আমি ফোটালাম সমস্ত আকাশে,
একটি আলোর রেখা জ্বালালাম হৃদয়ের পাশে।
তারপর কী করে জানে কে
তারাটা হারিয়ে গেছে মেঘে আজো বুক আছে ঢেকে।

আমিও তো ছিলাম উদ্দাম মহানদী।
উদ্বেল প্রপাত থেকে অতলান্ত সমুদ্র অবধি
প্রসারে তৃপ্তিতে সুখে সম্পূর্ণ ছিলাম।
তারপর কী খেয়ালে একগুচ্ছ ফুল ফোটালাম
নতুন মাটিতে এক চর পেতে। সে চর কখন
দিগন্ত-বিস্তৃত হল, হল এক সীমাহীন বন।
সে অরণ্যে আজ আর নেই ফুলফল,
ঊর্মিহীন গতিহারা নদী আজ সংকীর্ণ পল্বল॥

১৯৬০

ছুটি প্রেমের কবিতা

১

জীবনে তোমাকে পেলাম না,
মৃত্যুতেও তোমাকে পেলাম না,
তবু আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছুই পাই নি।

তুমি নদীর মত চঞ্চল নয় যে
জীবনে তোমাকে পাব,
তুমি পাথরের মত স্তব্ধ নয় যে
মৃত্যুতে তোমাকে পাব,
তুমি গোধূলির ছায়াচ্ছন্ন ম্লান আকাশ,
সেখানে আলোছায়ার লীলা নেই।

তাই তোমাকে পাবার জন্য
আমি জীবনকে ত্যাগ করেছি,
আর তোমাকে পাবার জন্য
আমি মৃত্যুকেও করেছি পরিহার।
জীবন-মৃত্যুর মধ্যদেশে দাঁড়িয়ে,
তোমার অচেতন দেহ কাঁধে নিয়ে
আমি শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি॥

২

তুমি কি সেই গল্পটা পড়েছ ?
যেখানে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে
হীরে মুক্তো সোনা মাণিক্য খুব ভালবাসত বলে
কোন এক পরীর শাপে
সোনার প্রতিমা হয়ে গেল ?

তার দাঁতগুলো হল মুক্তোয় গড়া,
তার চোখ হল দুটি কালো হীরের টুকরো,
তার অঙ্গ হল সোনার প্রতিমা ;
সমস্ত পৃথিবীতে সে-ই হল শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।
শুধু তার প্রাণ আর মন,
প্রেম আর আত্মা,
আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন,
নিরেট পাথরের মত স্তব্ধ মৃত্যুতে
বিলীন হয়ে গেল।

আমি তোমাকে অনুরোধ করছি,
আমি তোমাকে মিনতি করছি,
তুমি সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটির মতো
আমার কাছে এসে বল —
আমাকে হীরে মুক্তো মাণিক্য দাও,
সোনা চুনি পান্না দাও,
আমাকে বিশ্বের সম্পদ দাও
কেননা আমি ঐশ্বর্য ভালবাসি।

তুমি যদি আমাকে একথা বল,
যদি একান্ত মনে বল,
যদি প্রাণ দিয়ে বল,—
তবে সেই পরীর মতন জাদুমন্ত্রে
আমি তোমাকে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যে
মণ্ডিত করে দেব।
তোমার প্রাণ যদি না থাকে
তবু তোমার অঙ্গ হবে সোনার,

তোমার কামনা যদি না থাকে
তবু তোমার চোখে থাকবে হীরের ধার,
তোমার মন যদি না থাকে
তবু তোমার হাসিতে রাশি রাশি মুক্তো ঝরবে,
আর, কখনো তোমার চুনির ঠোঁট থেকে
সে হাসি মিলিয়ে যাবে না।
কখনো নিববে না তোমার চোখের জ্বালা।
কারণ তখন তুমি অমর হবে।

কারণ তখন তুমি অমর হবে॥

ডিসেম্বর ১৩৬১

কালো পাহাড়

এই অন্ধকারে এসো না।
এ-অন্ধকার পাথরের মতো কঠিন।
অনেক আলোতে অবগাহন করে,
অনেক বর্ণের স্রোতে সাঁতার কেটে
তবেই আমি এই অন্ধকারে পৌঁছুতে পেরেছি।

এ-অন্ধকারে এসো না ;
কারণ, এ-অন্ধকারের বায়ু তোমার নাসিকার ঘ্রাণ কেড়ে নেবে,
তুমি ফুলের সৌরভ পাবে না।
এ-অন্ধকারের বর্ষণ তোমার মুখের স্বাদ ধুয়ে দেবে,
শুধু তৃষ্ণা ছাড়া তোমার জিহ্বায় আর কিছুই থাকবে না।
তুমি দেখবে মহাশূন্যে নিশ্ছিদ্র মেঘের মতো স্তম্ভিত কৃষ্ণতা।
তুমি যা ছুঁতে চাইবে দেখবে তুমি তার নাগাল পাও না।

এ-অন্ধকারে এসো না।
অনেক সোনালি রোদ সাঁতরে আমি
এই নিষ্ঠুর কালো পাহাড়ে এসে পৌঁছেছি।

তবু, তবু, যদি তুমি কোনোদিন এখানে আসো,
যদি এসে পৌঁছও,
তবে হয়তো তুমি দেখবে যে,
এই নিষ্ঠুর অন্ধকার, এই প্রবঞ্চক অন্ধকাব,
তোমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে
একটুখানি করুণা, একটু সান্ত্বনার কণা।

যদি তুমি কান পেতে থাকো,
যদি তুমি অনেক বিনিদ্র রাত্রি স্তব্ধ হয়ে থাকো,
তবে, হয়তো শুনতে পাবে একটা ক্ষীণ সুর,
একটা দূরাগত গানের অস্পষ্ট শেষ কলি।

আর তখন, শুধু তখনই তুমি
এই নিষ্ঠুর অন্ধকারকে ভালবাসবে।
কেবল তখনই তোমার মনে হবে,
অজস্র রোদের সোনালি স্রোত ঠেলে
এতদূরে ভেসে আসা তোমার সার্থক হল॥

আশ্বিন ১৩৭০

দুঃখ

দুঃখ নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখব,
দুঃখ দিয়ে আমি একটা জগৎ সৃষ্টি করব,
দুঃখ সৃষ্টি ক'রে আমি স্রষ্টা হব,
কারণ দুঃখ সৃষ্টি করা সহজ।

তুমিও কি পার না স্রষ্টা হতে ?
তুমিও কি বৈজ্ঞানিক কিংবা নেতা হয়ে,
মন্ত্রী কিংবা সেনাপতি হয়ে,
নায়ক কিংবা প্রতিনায়ক হয়ে,
অজস্র দুঃখ সৃষ্টি করতে পার না ?

মানুষের মন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা,
মানুষের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত রুধিরাক্ত করা,
মানুষের জীবন হতাশায় নিরাশায় ক্লিষ্ট করা
কত সহজ যদি জানো,
তবে তুমি সুমহৎ ট্র্যাজেডির স্রষ্টা হতে পার,
তবে তুমি সেক্সপীয়রের সমান হতে পার,
তবে তুমি ভগবানের সমান ॥

কার্তিক, ১৩৭০

গান্ধীজি

সূর্যের পরিধি যদি নয়নের ছোট পরিমাপে
বিচার করেছি কোনোদিন,
আজ জানি, এই প্রাণ এ-চেতনা যে উত্তাপে বাঁচে
সকলি সে-সবিতার ঋণ।
দুর্বল মুহূর্তে কোনো যুক্তি কিংবা বুদ্ধির প্রয়াসে
যদি তাঁরে গিয়ে থাকি ছুঁতে,
বুদ্ধির উদ্বাহু আজ সেথা হতে ব্যর্থ হয়ে আসে
বিস্তৃত যা জীবনে মৃত্যুতে।

পশ্চাতের দৃষ্টি আজ সম্মুখ দিগন্তে খোঁজে পথ,
ভুলে যাই তর্কের জিজ্ঞাসা,
মূর্ছায় নীরব কণ্ঠে শুনি যেন বাঁচার শপথ
জীবনের একমাত্র ভাষা,
যে-জাদুতে ভোর হয়, মাঠে ফলে সোনার ফসল
সে-জাদুর উৎস খুঁজে দেখি,
দুর্বার আত্মার সৃষ্টি-প্রেরণাই সেখানে সম্বল,
সেই-সত্য, আর সবি মেকি।

আকাশের মতো আজ পরিব্যাপ্ত সর্বসত্তাময়
তর্কাতীত যে সত্য চেতনা,
হীনতার সংকোচেরে দূর করে যে আত্মপ্রত্যয়
সবি এক স্রষ্টার রচনা।
প্রাণের সারথিরূপে জানি যারে—নিরস্ত্র অজেয়,
দুর্বোধ্য তথাপি প্রিয়তম,
জীবনে জীবনরূপী, অমৃত যা জীবনাতীতেও
চিরন্তন সে আত্মারে নমো॥

১৯৪৮-৪৯ ?

রবীন্দ্রনাথ

অশ্রু-আঁখি দুঃখময়ী জননী মলিনা শ্যাম মাটি
আমি ভালোবাসি—এই কথা বলে, স্বর্ণ ডানা মেলে
উর্ধ্বলোকে গিয়েছে সে। মর্মমাঝে সৌরবহ্নি জ্বেলে
দুঃখের দহনে পুড়ে নিজে, তবু আলোর শিখাটি
আমাদের অন্ধকার পথে রেখে, চলে গেছে দূরে
সীমা আর অসীমের সাগর-সঙ্গমে। পৃথিবীর
রূপাঞ্জন আমাদের চোখে মেখে দিয়ে সুগভীর
স্নেহভরে, বেঁধেছে সে মনোবীণা শাশ্বতের সুরে।

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম। জীবনের সৌন্দর্যে বিভোর,
তবু মৃত্যু-অতিক্রান্ত অনন্ত আনন্দ তার বুকে।
হৃদয়ের সারথি সে, বিধাতার শঙ্খ তুলে মুখে
চূর্ণ করে দিয়েছে সে যৌবনের সুষুপ্তির ঘোর।
তারপর, 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়' এই কথা বলে
অন্য কোথা চলে গেছে, কিংবা আজো যায় নি সে চলে॥

৩রা বৈশাখ, ১৩৭০

হার

আমি মৃত্যুকে জয় করেছি,
কিন্তু জীবনের কাছে হেরে গেলাম।

কালো পাথরের মতো অন্ধকার কল্পনার আড়াল থেকে
মৃত্যু বারে বারে হুংকার দিয়ে বলেছে 'অয়মহং ভো।'
বলেছে 'আমি মৃত্যু, আমাকে ভয় কর।'
বলেছে, 'আমি বীভৎস, আমি বিভীষিকা।'
বলেছে, 'তুমি পরাজয়ে অবনত হও।'
কিন্তু আমি তখন আমার প্রেয়সী জীবনের থেকে
অভিমানভরে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম।
মৃত্যুকে বলেছিলাম, 'এসো এসো, আমাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ কর।'
বলেছিলাম, 'তোমার কালো পর্দার আড়ালে
আমাকে বিশ্রামের আশ্রয় দাও।'

কিন্তু মৃত্যু সেদিন আমার সম্মুখীন হয়নি,
আমাকে আলিঙ্গন করেনি,

আমার সঙ্গে সংগ্রামও করেনি,
শুধু আপন পরাজয়ের লজ্জায়
কুয়াশার মতো নিজেকে অপসৃত করে নিয়েছে।

আর জীবন!
তার পায়ে যতবার আমি প্রেম নিবেদন করেছি,
ততবার সে আমাকে দিয়েছে বিদ্রূপের কশাঘাত।
যতবার আমি তাকে সংগ্রামে আহ্বান করেছি,
ততবার সে আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে বলেছে,
'আমি ছাড়া তোমার যে আর কিছুই নেই।'
আমি প্রেমের মালা দিয়ে জীবনকে বাঁধতে পারিনি,
তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে তাকে বিঁধতে পারিনি,
কাতর অনুনয়ে তার করুণা পাইনি;
কারণ, আহত ক্লান্ত শৃঙ্খলিত
আমি জীবনের কাছে হেরে গেছি॥

অভিনায়িকা

নায়িকার ভূমিকায় তোমাকে মানায় ভারি ভালো,
হাজার পাওয়ার পাদপ্রদীপেতে তুমি জ্যোতির্ময়ী।
সত্য-মিথ্যা দুই রূপে মিলে একাধারে তুমি দ্বয়ী,
তোমার হাসি ও কান্না জোর ক'রে আনাতে জোরালো,
কত যে মধুর কথা মুগ্ধ দর্শকের কানে ঢালো,
কত যে নিরীহ হয়ে অনায়াসে হও দিগ্বিজয়ী,
যারা নিত্য দেখে তারা হাড়ে-হাড়ে জানে সেটা অয়ি,
শুধু চোখে শাদা-সিধে, মনশ্চক্ষে তুমি জমকালো।

আমি আছি দর্শকের ভূমিকায় অন্ধকার কোণে,
যদিও এদিকে তুমি চোখ ফেল দেখ না আমাকে,
তুমি দেখ তোমাকেই, আর দেখ সাম্রাজ্য তোমার।
অভিনয় শেষ হলে প্রেক্ষাঘর হবে অন্ধকার,
আমি হেসে পথে নেমে চলে যাব সংসারের ডাকে,
তোমার সাম্রাজ্য হতে বহু দূরে চির-নির্বাসনে ॥

জলের লেখন

আমাদের ইতিহাস লেখা হয় জলের রেখায়
রক্তের অক্ষরে মুছে যায়।

কত যুগ যুগান্তের বিবর্তনে গড়ে তোলা মন,
কত তার সমারোহ, রূপে রসে কত আবর্তন,
একদিন মানুষের ইতিহাস-রথচক্রতলে
শেষ চিহ্নটুকু তার চূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে চলে।
দুর্গম কান্তার-মরু পার হয়ে কাছাকাছি আসা—
তখনি রক্তাক্ত বানে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে ভাসা।
তাই কাব্যে লেখা যত মনের পাণ্ডুর ইতিহাস
মনে হয় চিরন্তন নিষ্ফল প্রয়াস।

আমন্ত্রণ শব্দমন্ত্র জপ করে দুর্বল হৃদয়,
তীব্র বিতাড়ন মন্ত্রে দ্রুত তার নিশ্চিত বিলয়।
যত ছন্দ যত গান যত কাছে ডাকা,
সকলি সজল দিনে জলের রেখায় যেন আঁকা।
মানুষ সান্নিধ্য খোঁজে, এ কল্পনা সুখস্বপ্ন মতো,
রক্ত তাজা রক্ত চায়, এই সত্য পার্থিব শাশ্বত ॥